"আজ শান্তির পথ অবলম্বন করে একজন মানুষ
তার কাঙ্ক্ষিত সমস্ত কিছু অর্জন করতে পারে।"

শান্তির যুগ

*মানুষ এবং মহাবিশ্বের জন্য
শান্তিই একমাত্র সংস্কৃতি*

মাওলানা ওয়াহিদউদ্দিন খান

“আজ শান্তির পথ অবলম্বন করে একজন মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত সমস্ত কিছু অর্জন করতে পারে।”

শান্তির যুগ

মানুষ এবং মহাবিশ্বের জন্য শান্তিই একমাত্র সংস্কৃতি

মাওলানা ওয়াহিদউদ্দিন খান

অনুবাদ ঃ সৈয়দ তানভীর নাসরীন

Goodword Books

English Version: The Age of Peace
First published 2017
Reprinted 2023

Goodword Books
A-21, Sector 4, NOIDA-201301
Delhi NCR, India
Tel. +9111-41827083, Mob: +91-8588822678
email: info@goodwordbooks.com
www.goodwordbooks.com

Center for Peace and Spirituality
1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013
Mob. +91-9999944119
email: info@cpsglobal.org
www.cpsglobal.org

Center for Peace and Spirituality USA
2665 Byberry Road, Bensalem, PA 19020, USA
Cell: 617-960-7156
email: kkaleemuddin@gmail.com

Peace and Spirituality Forum
(Bengal Chapter of CPS International)
mwkbangla@gmail.com

Printed in India

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা ৭

প্রাককথন ৯

প্রথম অধ্যায় ঃ শান্তির জন্য শান্তি

শান্তিবাদের উপর ১২

শান্তি ঃ সর্বাধিক মঙ্গল ১৫

শান্তি এবং ন্যায় ১৮

শান্তির ক্ষমতা ২১

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ শান্তির যুগের আবির্ভাব

একচেটিয়া অধিকার মোচনের যুগ ২৪

পশ্চিমী সভ্যতা ২৭

বিকল্প সমূহের যুগ ২৯

সভ্যতার যুগ ৩২

সভ্যতার পথে যাত্রা ৩৫

শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা সাধন ৩৮

তৃতীয় অধ্যায় ঃ শান্তির জন্য বিরোধহীন উপায়সমূহ

স্রষ্টার সৃষ্টিবিধান ৪১

পারস্পরিক হস্তক্ষেপহীনতার নীতি ৪৩

‘নিজেকে বাঁচাও’ ফর্মুলা ৪৬

বিচ্ছিন্ন করার নীতি ৪৯

হিংসার ক্ষমতা অপেক্ষা শান্তির ক্ষমতা বেশি ৫২

দুজন পয়গম্বরের প্রতিষ্ঠা করা উদাহরণ ৫৫

একটি প্রতিষ্ঠানসিদ্ধ সংঘর্ষনিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা ৫৮

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ইতিহাসের অভিজ্ঞতা

আদর্শবাদ ও বাস্তবধর্মিতার মধ্যে বাঁচা ৬২

বাস্তবতার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ পরিকল্পনা ৬৪

সহিংস কর্মকাণ্ড, শান্তিপূর্ণ কর্মকাণ্ড ৬৭

যে ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল ৭০

অন্তহীন যুদ্ধ ৭৩

সংকট ব্যবস্থাপনার সমস্যা ৭৬

ঐতিহাসিক স্থিতাবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখো ৭৯

ইতিহাস থেকে শিক্ষা ৮২

পঞ্চম অধ্যায় ঃ একটি প্রতি-আদর্শের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান যুগে মুসলমানদের প্রসঙ্গ ৮৭

একটি সাহিত্য বোমা প্রয়োজন ৯০

মুসলমান তরুণদের চরমপন্থা ৯৪

নির্বাচিত তথ্যের কুফল ৯৮

আত্মঘাতী বোমাহানা ১০২

দৃষ্টিকোণের উপরেই সমস্ত নির্ভর করে ১০৫

একটি নতুন যুগে বাস করা ১০৯

তরুণরা কেন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীতে যোগ দিচ্ছে? ১১২

শিক্ষার মাধ্যমে শান্তি ১১৫

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ মুসলিম বিশ্বে শান্তি

মানসিক শান্তি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ১১৯

অসমাপ্ত কর্মসূচী ১২২

ডি গলের পদ্ধতি পথ দেখাচ্ছে ১২৫

প্রশমিত ধারা, উচ্চকিত ধারা ১২৮

শান্তির পথ ১৩১
ধারাপ্রতিষ্ঠার ভূমিকায় ধর্মযুদ্ধগুলি ১৩৪
নীতিরূপে ভ্যাটিকান ১৩৭
আত্মসপক্ষীয় কর্মকাণ্ড, আত্মবিরোধী কর্মকাণ্ড ১৪১
সন্ত্রাসের সংস্কৃতি ১৪৫
একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ১৪৮

সপ্তম অধ্যায় ঃ ইসলাম ও শান্তি

শান্তির ধর্ম ইসলাম ১৫২
পারস্পরিক নির্ভরতা ঃ প্রকৃতির একটি নিয়ম ১৫৫
ইতিহাসের চূড়ান্ত মন্দ ১৫৭
শান্তিসদনে ঈশ্বরের আহ্বান ১৬০
মানব ইতিহাসের ব্যবস্থাপনা ১৬৩
বিশ্ব শান্তি কেন্দ্র ১৬৬
তথ্যসূত্র ১৬৯

প্রস্তাবনা

হিংসা ও যুদ্ধের ইতিহাস যত প্রাচীন, শান্তি প্রচেষ্টার ইতিহাসও ঠিক ততটাই। রবীন্দ্রনাথ, 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' লিখে কোনো এক মহামানবকে প্রেমপদ্ম বিকশিত করার আহ্বান করেছিলেন। তারপরে অনেক দিন কেটে গেছে। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক উদ্যোগে অনেকে চেষ্টা করেছেন।

সমস্ত শান্তিকামী মানুষের মত আমিও নিজের মত করে সেই সমস্ত শুভপ্রয়াসের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে থাকি।

ইতিহাসের একজন অধ্যাপক হিসেবে মনে করতে পারি, এই অনুবাদ আসলে এক আশ্চর্য কাঙ্খিত সমাপতন, অথবা, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলে, এটি সৃষ্টিকর্তার নির্ধারিত বিধান। জীবনের সেই ক্রমেই মওলানা ওয়াহিদউদ্দিন খানের গুণমুগ্ধ ভক্তদের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। কিছুটা আলাপ হতেই কলকাতা টিমের সদস্যগণ তাঁদের দর্শনের কথা বলেছিলেন, তাঁদের মতবিশ্বাসের বিভিন্ন বই পড়তে দিয়েছিলেন এবং আরো বিশদ আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। প্রাথমিকভাবে তাঁদের অনুরোধেই এই অনুবাদের চেষ্টা।

প্রথমবার *দি এজ অব পীস* (শান্তির যুগ) পড়েই আমি এটি অনুবাদের সিদ্ধান্ত নিই। পৃথিবী জুড়ে যে ধ্বংসলীলা চলছে, আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত হিংসা-যুদ্ধ-হত্যা-সন্ত্রাসের যে বিষবাষ্প বেড়ে চলেছে তার মধ্যে এই বই যেন এক ঝলক স্নিগ্ধ বাতাস, একটা উজ্জ্বল আশার আলো।

এই বই সাতটি প্রধান অধ্যায়ে বিভক্ত যেখানে ক্রমান্বয়ে শান্তি- ন্যায়- সভ্যতা- ইতিহাস ও ধর্ম, বিশেষত ইসলাম ও তার অনুরাগীদের বর্তমান সংকট ও সেই সংকট মোচনের পথে দেখানো হয়েছে। ব্যক্তি, সমাজ ও চিন্তন সমূহের মধ্যে সমস্ত পার্থক্যকে স্বীকার করে কিভাবে অহিংস উপায়ে সকলের অগ্রগতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব, তা এই বইয়ে একাধিক উদাহরণ সহযোগে প্রতিষ্ঠিত। আজকের পৃথিবীতে ইসলামী সন্ত্রাস একটি বিশেষ সমস্যা। ক্ষোভ, ক্রোধ, অভিযোগ, অশিক্ষা, নিরাপত্তার অভাববোধ সব মিলে বিপথগামী এক শ্রেণীর মুসলমান সন্ত্রাসবাদে সামিল হচ্ছে।

ইসলামে সন্ত্রাসের অনুমোদন নেই, হত্যা, তথা আত্মহত্যারও কোনো স্থান নেই। কোরান-হাদিস থেকে একাধিক উদ্ধৃতি-উদাহরণের মাধ্যমে মওলানা ইসলামের শাশ্বত পবিত্র শান্তিকামী রূপটি তুলে ধরেছেন। এই বই প্রতিষ্ঠা করে সন্ত্রাসের মত দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার মাধ্যমে নয়, প্রায়-কলুষিত হয়ে ওঠা 'জিহাদ' শব্দটির আসল তাৎপর্য মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের বার্তা, শান্তির বার্তা, সদর্থক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার গুরুদায়িত্বে নিহিত।

বিশ্ব শান্তি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের সকলের চেষ্টায় বিশ্বকে শান্তি কেন্দ্র করে তোলার চেষ্টা করতে পারি।

সৈয়দ তানভীর নাসরীন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ইদ-উল-ফিতার
২০১৬

প্রাককথন

তারিখটি ছিল ১২ই জানুয়ারী, ২০১৫। আমি নতুন দিল্লির ম্যাক্স হাসপাতালের একটি বিছানায় শুয়েছিলাম, অস্ত্রোপচারের পরে তখন আমি গভীর যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন। আমার ঘরে ঢুকে এসে ডাক্তার এক সময় বললেন, 'চিন্তা করবেন না, এটি একটি সাময়িকপর্ব। অচিরেই সমস্তকিছু স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।' আমি সারারাত্রি ঘুমাই নি এবং ডাক্তারের ঐ কথাগুলি নিয়ে অমি চিন্তা করছিলাম। আমি তাদের কথা ভাবছিলাম, যারা এখনকার দিনে নিজেদের নির্মিত তথাকথিত এক ধর্মযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে।

সহিংসতার এই প্রচারকরা সর্বত্র অন্য মানুষদের তাদের লক্ষ্য করে তুলেছে - উপাসনালয়ে, বাজারে, হোটেলে, সমস্ত জায়গায়, এমনকি কবরখানাতেও। তাদের লাগামহীন সহিংসতার কারণে বহু সংখ্যায় নিরীহ মানুষ নৃশংসভাবে খুন হয়েছে। তখন আমার কোরানের একটি আয়াত মনে পড়ল; তাতে বলা হয়েছে, একজন মানুষের হত্যা সমস্ত মানবতাকে হত্যা করার সামিল (৫.৩২)। এখন পৃথিবীতে সাতশো কোটিরও বেশি মানুষ বাস করে। অর্থাৎ, যে একজন মানুষকেও হত্যা করে সে সাতশো কোটি মানুষকে হত্যাপরাধের জন্য দণ্ডনীয়। এই ভাবনা মনে আসায় আমি খুবই মর্মপীড়া বোধ করলাম এবং আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম যে, যারা অন্যদের হত্যা করে, তারা কিভাবে এই কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

মানবহত্যালীলা বিষয়টির গুরুত্বের পিছনে কারণ কী? আপাতভাবে মনে হয়, বিষয়টি মানুষের সঙ্গে যুক্ত এটিই কারণ, কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, একজন মানুষকে হত্যা করা ঈশ্বরের সৃষ্টি পরিকল্পনায় সরাসরি হস্তক্ষেপের সামিল। এর ফলে একজন মানুষকে তার পূর্ণ আয়ু বেঁচে থেকে ঈশ্বর তার জন্য যে নির্দিষ্ট ভূমিকা রেখেছিলেন, তা পালন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। যখন একজন মানুষ ঈশ্বর দেওয়া জীবনবৃত্ত সম্পূর্ণ করতে পারে, একমাত্র তখনই সে পৃথিবীতে তার নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে। অবশ্যই, হত্যা এবং জীবনদান দুটিই সরাসরি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যখন একজন মানুষ এই বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারবে, সে কাউকে হত্যা করার সাহস পাবে না। এই ধারায় চিন্তা করতে করতে আমি সেই সমস্ত আত্মঘাতী বোমাহানার সঙ্গে যুক্ত সন্ত্রাসবাদীদের কথা ভাবতে শুরু করলাম। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম ও আইনি ব্যবস্থায় আত্মহত্যাকে বেআইনি মনে করা হয়। হজরত মহম্মদের একটি পরম্পরা অনুসারে মনে করা হয় আত্মহত্যাকারী ব্যক্তিকে অনন্ত নরকবাস করতে হবে। একথা মনে আসতেই আমি কেঁপে

উঠলাম এবং আমার দুচোখে জল গড়িয়ে পড়ল। আমি ভাবছিলাম আমি যখন এই সামান্য সাময়িক যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না, তারা কীভাবে মৃত্যুর পরবর্তী জগতে অনন্ত যন্ত্রণা সহ্য করবে?

হজরত মহম্মদের এক অনুচর একবার এই কাহিনী বিবৃত করেন: "একটি যুদ্ধে (গাজ্ওয়া) আমরা হজরত মহম্মদের সঙ্গী হয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে কুজমান নামে এক ব্যক্তি ছিলেন; তিনি ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। অন্যরা হজরত মহম্মদের সামনে তার সাহসিকতার প্রশংসা করছিল। কিন্তু হজরত বললেন, "ইন্নাহু মিন আহ্ল্ আন-না'আর।" অর্থাৎ এই ব্যক্তি নিশ্চয় নরকবাসীদের একজন। অনুচরেরা হজরতের কথায় যারপরনাই আশ্চর্যান্বিত হল, সেইজন্য তিনি তাদের এই বিষয়টি অনুসন্ধান করতে বললেন। তখন জানা গেল যে যুদ্ধে কুজমান গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন; যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠলে তিনি নিজের অস্ত্র দ্বারা নিজেকে হত্যা করেন (কুজমানের ঘটনাটি আত্মহত্যার উদাহরণ)। যখন হজরত মহম্মদকে বিষয়টি জানানো হয়, তিনি বলেন, "ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং আমি এই সাক্ষ্য বহন করছি যে আমি তাঁর বার্তাবাহী।"[১]

আমার জন্য সেটি এক ভয়ংকর রাত্রি ছিল। আমি সেই রাত্রেই সিদ্ধান্ত নিই যে, সেরে ওঠার পরে, শান্তি বিষয়ক একটি বই লেখা আমার প্রথম কাজ হবে। এই বইটি সেদিন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে নেওয়া সিদ্ধান্তের ফসল।

যারা সর্বদা হিংসার মাত্রায় চিন্তা করে তাদের মনের পুনর্বিন্যাসের চেষ্টা এই বইয়ের উদ্দেশ্য। সহিংস পদ্ধতির দ্বারা যা অর্জন করা যায় না, শান্তিপূর্ণ উপায়ে তা সফলভাবে অর্জন করা সম্ভব; তাদের মধ্যে এই উপলব্ধি ঘটানোই এই বইটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

ঈশ্বর যেন এই লেখকের সেই উদ্দেশ্য গ্রহণ করেন এবং এই বইটি যেন মানব ইতিহাসে সহিংসতা থেকে শান্তির পথে একটি নতুন বিপ্লব সূচনা করতে সমর্থ হয়।

দুজন ভদ্রমহিলা এই বইটি রচনায় আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছেন; তাঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এঁদের একজন ডঃ ফরিদা খানম, তিনি নতুন দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার অধ্যাপক। অন্যজন মারিয়া খান, তিনি পদার্থবিদ্যায় বি এস সি পাশ করে এখন নতুন দিল্লির জামিয়া হামদর্দে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে গবেষণা করছেন। ধন্যবাদ জানাতে চাই আইজাজ আহমেদকেও, যিনি এই বইয়ের পাণ্ডুলিপিটি পড়ে নিজের মন্তব্য জানিয়েছিলেন। ঈশ্বর এদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন।

ওয়াহিদউদ্দিন খান
নতুন দিল্লি, জুলাই ২৬, ২০১৫

প্রথম অধ্যায়

শান্তির জন্য শান্তি

শান্তিবাদের উপর

যে সমস্ত মানুষ যুদ্ধ এবং তার সহযোগী যাবতীয় অমঙ্গল—যেমন, হিংসা, ধ্বংস, জীবহত্যা বিশেষভাবে যা স্বাভাবিক মানব অস্তিত্বকে বিপন্ন করে, সেগুলো সর্বতোভাবে ঘৃণাকর ও পরিহার্য মনে করেন, তাঁরা সকলেই শান্তির মতবাদে বিশ্বাস করেন। যুগ যুগ ধরে, একেবারে আদিকাল থেকেই, শান্তি একটি বাধ্যতামূলক আগ্রহের বিষয় এবং সমস্ত চিন্তাশীল মানুষের চর্চার বিষয়। অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে সেইন্ট অগাস্টাইন পর্যন্ত, বারট্রাণ্ড রাসেল থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত, মহামানবেরা সকলেই এই বিষয়টি নিয়ে ভাবিত ছিলেন এবং সকলেই শান্তির পথে দৃঢ় থাকার কথা বলেছেন। ১৯৩৭ সালে শান্তিবাদের উপর একটি মহাকোষ প্রকাশিত হয়, তবুও আজ পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কোনো সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য ফর্মুলায় পৌঁছানো সম্ভব হয় নি।

প্রাথমিক প্রশ্নটি হচ্ছে: কিসের জন্য শান্তি? অথবা শান্তির বৈশিষ্ট্য কী? শান্তিবাদীরা সাধারণভাবে মনে করেন যে সামাজিক ন্যায় শান্তির অংশ, অথবা শান্তি একমাত্র তাই, যা সকলকে ন্যায় এনে দেয়। শ্রমিক স্বার্থ বিষয়ক রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার সংবিধানে প্রত্যয়িত হয়েছে: একমাত্র সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতেই বিশ্বব্যাপী এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব[১]।

শান্তি সম্পর্কিত এই ধারণা সাধারণভাবে বিদ্বজ্জনেদের মধ্যেও গ্রহণীয় হয়েছে।

প্রশ্ন ওঠে, কেন মানব ইতিহাসের ধারায় এই অর্থে কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি, অর্থাৎ সামাজিক ন্যায় সহ শান্তি। ইতিহাস এ বিষয়ে পরীক্ষামূলক সাক্ষ্য বহন করে যে শান্তির বর্ণনা প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এবং একথা সত্য যে এই বিশ্বে প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে আসঞ্জিত না হলে কারো পক্ষে কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়।

শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিফলতার প্রধান কারণ এই যে পন্ডিতেরা প্রায় সকলেই শান্তিকে কয়েকটি অবান্তর বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। তাঁদের মতানুসারে যথার্থ শান্তি হচ্ছে সেই অবস্থা যেখানে কোনো অন্যায় নেই, মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো দৃষ্টান্ত নেই, কোনো অসাম্য এবং কোনো রকম হিংসা নেই।

যে মাটি থেকে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়, যা ছাড়া আমাদের বেঁচে থাকা কঠিন, আমরা সেই মাটির উদাহরণ নিই। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, আমাদের প্রথমে উর্বর জমি সংগ্রহ করতে হবে এবং তারপর তা কৃষিকাজের উপযুক্ত করে তুলতে হবে। শান্তির ক্ষেত্রেও তাই। শান্তি হল সেই 'সামাজিক ক্ষেত্র' যা আবাদ করে আমরা সামাজিক ন্যায়ের ফসল পেতে পারি। ঠিক যেমন জমি থেকে সরাসরি খাদ্য পাওয়া সম্ভব নয়, তেমনই শান্তি থেকে সরাসরি সামাজিক ন্যায় পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে একপার্শ্বিক ভিত্তিতে শান্তি অর্জন করা সম্ভব; দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে নয় ।

এর অর্থ এই যে প্রথমেই আমাদের যাবতীয় সংঘাতপূর্ণ পদ্ধতি, যেমন রাজনৈতিক কর্মকান্ড, প্রতিবাদ ভিত্তিক কর্মকান্ড এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত কর্মকান্ড ত্যাগ করতে হবে। এইরকম একপার্শ্বিকতা স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠা করবে, স্বাভাবিকতা শান্তির দিকে যাবে এবং শান্তি সমস্ত ধরনের সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে। তারপরে, বিচক্ষণ পরিকল্পনার দ্বারা আমরা সামাজিক ন্যায় ও মানবাধিকারের সমস্ত মঙ্গল অর্জন করতে পারি।

একে বলা যেতে পারে শান্তির কৌশল। এর একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ হুদায়বিয়াহ্ চুক্তি, যা হজরত মহম্মদ ৬২৮ খৃষ্টাব্দে সম্পন্ন করেছিলেন। এই চুক্তি অনুসারে হজরত মহম্মদ তাঁর বিরোধীদের সমস্ত দাবি মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর সহযোদ্ধাদের কাছে তখন সেই বিষয়গুলি অবমাননাকার মনে হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এই চুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে এর ফলে যুদ্ধহীন একটি দীর্ঘ সময় সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছিল।

এই যুদ্ধহীন দশকের চুক্তিটি সুনিশ্চিত করার ফলে মহম্মদ এবং তাঁর সঙ্গীরা বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ধর্ম প্রচারের নির্বিঘ্ন সুযোগ পেয়েছিলেন। এটি একটি বিশাল সাফল্যের কাহিনী। এর নিহিতার্থ আলোচনা করলে আমরা বিষয়টির সম্পূর্ণ চিত্র পেতে পারি এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণের জন্য একটি সফল পদ্ধতি গড়ে তুলতে পারি। অন্যদের সঙ্গে সংঘাত ছাড়াই একমাত্রীয় ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা যখন সামাজিক ন্যায় ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই, সেটি দ্বিপাক্ষিক বিষয় হয়ে পড়ে। কারণ তখন অন্য গোষ্ঠীগুলি, যেগুলি অন্যায় ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী বলে আমরা মনে করছি, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংঘাতে লিপ্ত হতে হয়।

এই লক্ষ্যে যদি আমরা যাত্রা শুরু করি, তাহলে বিদ্যমান গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য এবং কাম্য লক্ষ্যে পৌঁছানোর পরিবর্তে, সংশ্লিষ্ট মানুষরা সংঘাতে জড়িয়ে

পড়বেন। অতএব প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে আমাদের একটি কার্যকরী পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। অবশ্যই, সামাজিক ন্যায় ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা খুবই বিচক্ষণ পরিকল্পনার দাবী করে। এই যাত্রা রাজপথের মসৃণগতি যাত্রা নয়, এই পথ কন্টকাকীর্ণ ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে।

অতএব, সামাজিক ন্যায়ের জন্য শান্তি কোনো কার্যকর ফর্মুলা নয়। একটিই কার্যকর ফর্মুলা আছে এবং তা হল স্বাভাবিকতার জন্য শান্তি। আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে বিচক্ষণ পরিকল্পনা প্রয়োজন, স্বাভাবিকতা আমাদের তা করার সুযোগ দেয়।

বিচক্ষণ পরিকল্পনার প্রকৃতি বিতর্কাতীত। অন্যদের (তারা সমাজের কোন অংশের মানুষ তা গুরুত্বপূর্ণ নয়) সঙ্গে কোনোরকম সংঘাত ছাড়াই এটি করা সম্ভব। এক্ষেত্রে ফর্মুলা হল: যে কোনো মূল্যে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা; তা সবরকম সুযোগ সম্ভাবনার পথ খুলে দেবে এবং বিচক্ষণ পরিকল্পনার মাধ্যমে সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে, আমরা সাফল্য অর্জন করতে পারব।

শান্তি: সর্বাধিক মঙ্গল

আক্ষরিক অর্থে সর্বাধিক মঙ্গল, সাম্মাম বোনাম আসলে নিজেই একটি লক্ষ্য এবং একই সঙ্গে সমস্ত মঙ্গলের আধার। বাস্তবে এই 'সাম্মাম বোনাম' বা সর্বাধিক মঙ্গল'কী? এ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। অধিকাংশ মানুষ মনে করেন স্বাধীনতা হচ্ছে সর্বোত্তম মঙ্গল, কিন্তু স্বাধীনতার বিবরণ কঠিন। কারণ 'সাম্মাম বোনাম' বা সর্বাধিক মঙ্গল হচ্ছে সেই জিনিস, যার চূড়ান্ত ব্যবহারেও কোনো নেতিবাচক ফলাফল নেই; অপরদিকে স্বাধীনতার অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। নৈরাজ্য নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি করে এবং তা বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক সমস্ত ধরনের উন্নয়নের সাফল্যকে ব্যাহত করে।

সত্য এই যে যথার্থ 'সাম্মাম বোনাম' হচ্ছে শান্তি, যা সব অবস্থাতেই ভালো। আমরা শান্তির যে ব্যবহারই করি না কেন, তার কখনও কোনো নঞর্থক প্রতিক্রিয়া নেই। শান্তি স্বাভাবিকতা নিয়ে আসে। এটি শান্তি সংক্রান্ত শ্রেষ্ঠ বিষয়, কারণ সমস্ত উন্নয়ন ও উন্নতি কেবলমাত্র স্বাভাবিক অবস্থায় ঘটতে পারে।

শান্তি দুই প্রকার: ব্যক্তিগত শান্তি ও সামাজিক শান্তি। ব্যক্তিগত শান্তির আরেক নাম মানসিক শান্তি। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য মানসিক শান্তি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। মানসিক শান্তি ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং একজন ব্যক্তি যদি নিজের ব্যবস্থাপনায় সক্ষম হয়, তাহলে সে মানসিক শান্তি ভোগ করতে পারে। অপর দিকে, সমাজে শান্তি আনয়নের বিষয়টি সামাজিক ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত।

আমরা যখন ইতিহাসের দিকে তাকাই, আমরা দেখি যে সামাজিক ব্যবস্থাপনা, আদর্শভাবে, একটি ছলনাময় লক্ষ্য। যে সংস্কারকরা আদর্শ সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করেছেন অনেক সময় দেখেছেন তাঁদের কর্মকান্ড সামাজিক শান্তির পরিবর্তে হিংসার সূচনা করেছে।

এই নেতিবাচক ফলাফলের কারণ কী? এর কারণ এই যে এই সামাজিক কর্মীরা সামাজিক শান্তির বিষয়টি সামাজিক ন্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করে ফেলেছেন। তাঁরা একটি তত্ত্ব খাড়া করেছেন যে সামাজিক ন্যায় ব্যতীত সামাজিক শান্তি নেই। তাঁরা অনুভব করলেন যে প্রথমে তাঁদের সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তার থেকেই সামাজিক শান্তির উদ্ভব হবে।

কিন্তু এই তত্ত্ব যথেষ্ট অস্বাভাবিক, অতএব কার্যকরী নয়। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, শান্তির ভূমিকা সমস্ত রকম কাজের ভিত্তি প্রস্তর করার বিষয়ে, যে কাজের দ্বারা আমরা ন্যায়ের লক্ষ্য অর্জন করতে পারি। শান্তির প্রাথমিক ভূমিকা স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠায়, এবং এটি সমস্ত রকম সাফল্যের পূর্বশর্ত। তাই, সর্বপ্রথম আমাদের যে কোনো মূল্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সমস্যা এই যে সামাজিক শান্তি একটি দ্বিপাক্ষিক বিষয়। চিরকাল সমাজ বিভিন্ন গোষ্ঠীর দ্বারা গঠিত হয়। এটি একটি অপরিহার্য শর্ত যে সমস্ত গোষ্ঠীগুলি যখন শান্তির সূচি গ্রহণ করবে একমাত্র তখনই যথার্থ শান্তি আসা সম্ভব।

তাহলে, সমাজের প্রতিটি অংশের জন্য সাধারণভাবে গ্রহণীয় অবস্থাটা কী? শান্তির জন্য শ্রেষ্ঠ ফর্মুলা হল অপরিবর্তনশীল অবস্থা (স্টেটাস ক্যো)। অর্থাৎ কেউ যদি স্থিতাবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চায়, তাতে হিংসার সূচনা ঘটতে পারে; কিন্তু কেউ যদি সেই স্থিতাবস্থা গ্রহণ করে, তবে শান্তি বজায় থাকে।

এই অবস্থায় কার্যকরী ফর্মুলাটি এইভাবে প্রকাশ করা যায়; ব্যক্তিগত শান্তির প্রেক্ষিতে আদর্শবাদ এবং সামাজিক শান্তির প্রেক্ষিতে বাস্তবধর্মিতা। এই নকশার মধ্যে অন্য কোনো ফর্মুলা কাজ করবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, জার্মানি এবং জাপান, দুটি দেশই তাদের যুদ্ধ বিধ্বস্ততা কাটিয়ে পুনরুন্নয়নের চেষ্টা করেছিল। এজন্য দুই দেশেরই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কিছু সমস্যাও ছিল। যেমন, এই যুদ্ধের ফলে জার্মানি তার পূর্বদিকের ভূখন্ড হারিয়েছিল। একথা জাপানের জন্যও প্রযোজ্য ছিল - জাপান তার গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ, ওকিনাওয়া, হারিয়েছিল এই যুদ্ধে। কিন্তু উভয় দেশই স্থিতাবস্থার ফর্মুলা গ্রহণ করেছিল।

বর্তমান অবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা না করে, নিজেদের নিয়ন্ত্রণে সেই সময় পর্যন্ত যে সম্পদ ছিল তা ব্যবহার করে তারা নিজেদের দেশের পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা রূপায়ণে সচেষ্ট হয়। দুই দেশই উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে এবং তারা অল্প সময়ের মধ্যে উন্নয়নের উচ্চ মান অর্জন করেছিল।

এটিই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়। যদি কেউ কোনো লক্ষ্য অর্জন করতে চায়, আধ্যাত্মিক বা বস্তুগত, তাকে এই ফর্মুলা অনুসরণ করতে হবে:

স্থিতাবস্থা গ্রহণ করে শান্তিপূর্ণ পরিকল্পনার মাধ্যমে নিজের লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা কর। এই ভাবে তুমি নিশ্চয় সাফল্য অর্জন করবে।

এ কথা সত্য যে শান্তিই সর্বাধিক মঙ্গল (সাম্‌মাম বোনাম), কিন্তু তুমি যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাও তোমাকে প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করতে হবে - সমস্ত কার্য সম্পাদনের ভিত্তি আসে শান্তি থেকে, শান্তি সম্পাদিত কার্যের ফল নয়। সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমে সঠিক ভিত্তি তৈরি করা এবং তারপর বিচক্ষণ পরিকল্পনার দ্বারা নিজের লক্ষ্য অর্জন করা।

শান্তি সেই মাটির মত। মাটি না থাকলে বৃক্ষ জন্মাতে পারে না। তেমনই শান্তি ব্যতীত সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

শান্তি এবং ন্যায়

আধুনিক বিশ্বে কিছু গোষ্ঠী আছে যারা হিংসায় ব্যাপৃত। যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা কর যে কেন তারা হিংসা-রক্তপাত ছড়াচ্ছে, তারা উত্তর করবে; ‘আমরা অন্যায়ের শিকার। আমাদের ন্যায়বিচার দাও, আমরা তোমাদের শান্তি দেব।’

শান্তির এই শর্ত অস্বাভাবিক। ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করে তা অর্জন করা অসম্ভব। এ যেন ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেওয়া! এই পৃথিবীতে সব কিছুই প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করে এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার কর্মটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, কারো হাতে উপহারের মত করে ন্যায় তুলে দেওয়া যায় না। এক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী হল, প্রথমে একপার্শ্বিক ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। শান্তি সমস্ত রকম সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে। তারপর বিচক্ষণ পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সম্ভাবনাগুলিকে কাজে লাগিয়ে ন্যায়ের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। ইতিহাসে এমন কোনো উদাহরণ নেই যে যুদ্ধ করে কেউ ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে।

শুধুমাত্র ন্যায়ের লক্ষ্যে শান্তি কাম্য নয়; স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠার জন্যও শান্তি কাম্য।

যখন স্বাভাবিকতা থাকে, সেই অবস্থায় সমস্ত সুযোগ পাওয়া যায়। সেই সুযোগগুলি ব্যবহার করেই কেউ ন্যায় অর্জন করতে পারেন।

অধিকার রূপে ন্যায় অর্জন করা যায় না। নিজেকে ন্যায়লাভের যোগ্য প্রমাণ করতে পারলে তা পাওয়া যায়। যদি তুমি সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ কর, তার জন্য অন্যদের প্রতি দোষারোপ করা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী নয়। তোমার উচিত নিজের সীমাবদ্ধতাগুলি চিহ্নিত করা। কারণ, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে তুমি যাকে অন্যায় বলছ, তা আসলে তোমার উৎকর্ষের অভাব। সেই কারণেই ন্যায় অর্জন করার জন্য তোমাকে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। শিক্ষা এবং কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা অন্যায় মোচন করা সম্ভব, দাবির দ্বারা নয়। অভিযোগ এবং প্রতিবাদের কৌশল তোমাকে ন্যায় এনে দেবে না।

আমাদের জগৎ প্রতিযোগিতার জগৎ। এই পৃথিবীতে শুধুমাত্র মেধা-উৎকর্ষের ভিত্তিতেই কিছু অর্জন করা সম্ভব, তা অভিযোগ এবং দাবির মাধ্যমে সম্ভব নয়। এই রকম বেশ কিছু মহান সংস্কারক ছিলেন যাঁরা দাবিদাওয়ার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় অর্জন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। তার কারণ এই যে তাঁদের যাত্রারম্ভের বিন্দুটি বাস্তববাদী ছিল না।

যাত্রারম্ভের একটিই বিন্দু আছে এবং তা হল মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা যাতে তারা ন্যায় প্রাপ্তির উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। উৎকৃষ্ট মেধাসম্পন্নদের জন্যই ন্যায়: এবং এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসে না। যদি তুমি ন্যায়ের উপযুক্ত হও, তুমি নিশ্চয়ই তা খুঁজে পাবে। কিন্তু যদি তুমি উপযুক্ত মেধাসম্পন্ন না হও, তাহলে তুমি ন্যায়লাভ থেকে বঞ্চিত হবে। অন্যান্য জিনিসের মতই, ন্যায় অর্জন করাও দেওয়া-নেওয়ার সুপরিচিত ফর্মুলার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যদি তুমি প্রয়োজনীয় দাম দাও, তবেই তুমি ন্যায় অর্জন করবে, অন্যথা নয়!

ন্যায় অর্জন করার পথে অন্যতম অন্তরায় এই যে বহু মানুষ আদর্শ ন্যায়ের ধারণা বিষয়ে মোহাচ্ছন্ন। কারণ আদর্শ ন্যায় সম্পাদন করা সম্ভব নয়, মানুষ যা পায়, তাদের মতে, তা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় কম। সেই কারণেই, এটি পাওয়ার পরেও তারা মনে করে তারা যথেষ্ট পায় নি। সত্য এই যে, এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তি আদর্শ ন্যায় পেতে পারে না, কেবলমাত্র কার্যকরী ন্যায় পাওয়া সম্ভব। সেই কারণে মানুষ যথেষ্ট সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে বঞ্চিতদের দলভুক্ত মনে করে। অতএব সমস্যার সমাধান হল মানুষের এই অশান্ত ভাবের উপশম করা, তার প্রতি অন্যায় হয়েছে এই ভাবকে প্রশমিত করা নয়।

ইতিহাসে এই রকম বহু উদাহরণ আছে যে মানুষের বঞ্চনাবোধ (এই বোধ যে তাদের প্রতি অন্যায়-অবিচার ঘটেছে) থেকে বহু হিংসা ছড়িয়েছে। কিন্তু বাস্তব এই যে তারা মনে করে তারা যা পায় তা তাদের দাবি বা চাহিদার থেকে অনেক কম।

সেই কারণে তাদের মধ্যে এক ধরনের অবিচারের শিকার হওয়ার ক্ষোভ জমতে থাকে, যদিও যে ধরনের ন্যায় তাদের পক্ষে সম্ভব, তারা তা পেয়ে থাকে। হিংসা বন্ধ করার উপায় হল মানুষের মন থেকে এই অবিচারের অভিযোগ নির্মূল করা, ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সংঘর্ষের দিকে তাদের ঠেলে দেওয়া নয়। সমস্ত অবস্থাতেই কার্যকরী ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব; আদর্শ ন্যায় নয়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার সংবিধান সেই কথা প্রতিষ্ঠা করে:

একমাত্র সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতেই বিশ্বব্যাপী এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।[১]

কিন্তু এটি ধরে নেওয়া বাস্তবসম্মত নয়। সত্য এই যে একমাত্র স্থিতাবস্থা মেনে নিলেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই স্থিতাবস্থার ধর্মীয় সমতুল হচ্ছে 'কানা'আত্', অর্থাৎ সন্তোষ বা তৃপ্তি। শান্তির মাধ্যমে বহু সম্ভাবনা সূচিত হয় এবং এই সম্ভাবনাগুলি সদ্ব্যবহার করেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

শান্তির ক্ষমতা

পণ্ডিতেরা সাধারণত শান্তির বর্ণনা বলতে যুদ্ধের অনুপস্থিতি বোঝেন। এই বিবরণ নেতিবাচক। শান্তির অস্ত্যর্থক বর্ণনা হবে যে এটি এমন এক অবস্থা যখন অনেকগুলি সম্ভাবনা উপস্থিত। শান্তির সর্বপ্রধান ভূমিকা এই যে তা বহু সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়, এবং প্রতিটি ব্যক্তি এই সম্ভাবনাগুলি ব্যবহার করে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর সুযোগ পায়।

জীবনে সম্ভাবনা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের সম্ভাবনাগুলিকে চিহ্নিত করে বিচক্ষণ পরিকল্পনার সঙ্গে সেগুলিকে ব্যবহার করলে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। অতএব যে কোনো মূল্যে জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। শান্তির ফলে সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে এবং সেই সম্ভাবনাগুলিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ যা চায় তা অর্জন করতে পারে। যারা হিংসার পথ অবলম্বন করে তারা প্রকৃতির এই নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞ, সেটাই প্রমাণ করে।

যেমন, যারা হিংসার সঙ্গে যুক্ত তাদের যদি নিজেদের কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় এবং আরো জানতে চাওয়া হয় তারা শান্তি বিষয়ে আগ্রহী কিনা, তাদের কাছ থেকে যে প্রতিক্রিয়া আশা করা যেতে পারে, তা হল, শান্তি বিষয়টি ভালো, কিন্তু তারা তো ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

এই ধরনের উত্তর যেন ঘোড়ার সামনে গাড়ি জুড়ে দেওয়ার মত। সত্য এই যে কেউ তোমার হাতে উপহারের মত ন্যায়বিচার তুলে দিতে পারে না। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলাফল হল ন্যায়। প্রথমত, তোমাকে যে কোনো মূল্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তারপর বিচক্ষণ পরিকল্পনার সঙ্গে ন্যায়ের পথে যাত্রা করতে হবে। এই হল ন্যায় প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ। অন্য কোনো পথ এই লক্ষ্যে পৌঁছবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, মিত্রশক্তি দ্বারা জার্মানি দুই ভাগে, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানিতে বিভক্ত হয়। এই কৌশলের দ্বারা স্থায়ীভাবে জার্মানিকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এটি অন্যায়ের পরিষ্কার উদাহরণ; কিন্তু জার্মান নেতারা কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন নি। যা ঘটেছিল তা এই যে প্রকৃতিকে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

একটি শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রকৃতি নীরবে কাজ করেছিল। ক্রমে বার্লিনের প্রাচীর ভাঙা হল এবং পঁয়তাল্লিশ বছর পরে, ১৯৯০ সালে, জার্মানি পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হল। আজ জার্মানির সেই দুটি অংশ মিলে একটি দেশ, যেমনটি তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ছিল। পশ্চিম জার্মানি কখনই পূর্ব জার্মানিকে অধিকার করার জন্য কোনো যুদ্ধ করে নি। জার্মানরা কেবলমাত্র শান্তির পথে হেঁটেছিলেন।

শান্তির সবথেকে বড় ক্ষমতা এই যে তা প্রকৃতিকে কাজ করার সুযোগ দেয়। যদি তুমি যুদ্ধের মাধ্যমে নিজের লক্ষ্য পূরণের কথা ভাবো, তাহলে তোমার নিজেকেও যুদ্ধ করতে হবে। অপর দিকে, শান্তি তার নিজের মত কাজ করে। যদি তুমি যুদ্ধ বন্ধ কর, শান্তি বিরাজ করবে। এক্ষেত্রে প্রকৃতিকে আমাদের একটি সুযোগ দিতে হবে। এই রকম অবস্থায়, প্রকৃতি তৎক্ষণাৎ কার্য করতে শুরু করে। একমাত্র শর্ত এই যে যখন প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হবে, কেউ তাতে হস্তক্ষেপ করবে না। একমাত্র প্রতিবন্ধকতাহীন পরিবেশেই শান্তি কাজ করতে পারে। যখন হস্তক্ষেপ ঘটে, প্রকৃতির পদ্ধতি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থেমে যায়। বীজ বপনের পরে বৃক্ষ যেমন আপন নিয়মে বেড়ে ওঠে, এটিই শান্তির সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। যাঁরা শান্তির এই অন্তর্নিহিত ক্ষমতার কথা বোঝেন, তাঁরা কখনও ব্যর্থতার সম্মুখীন হন না।

হিংসার মাধ্যমে তুমি একটা গাছ কেটে ফেলতে পারো, কিন্তু হিংসার দ্বারা তুমি গাছটির বৃদ্ধি ঘটাতে পারো না ।

অনুরূপ ভাবে একথা মানবজীবনের জন্যও সত্য। মনুষ্যজগতে, যুদ্ধ কেবলমাত্র ধ্বংস সূচিত করে। শান্তির অবশ্য একটি ইতিবাচক ভূমিকা আছে। যেখানে হিংসা, সেখানে কোনো গঠনমূলক কাজ করা সম্ভব নয়; অপর দিকে, শান্তি তার নিজের মত করেই গঠনমূলক কাজের পথ সুগম করে, স্বাস্থ্যকর ধারায় জাতি গঠনের পথ সুগম করে।

ক্রোধ থেকে যুদ্ধের শুরু এবং ক্রোধেই এর অবসান। যুদ্ধের কোনো স্বাস্থ্যকর বা গঠনমূলক বৈশিষ্ট্য নেই; শুরুতেও নয়, শেষেও নয়। কিন্তু শান্তি আদ্যন্ত একটি স্বাস্থ্যকর অবস্থার দ্যোতক। শান্তি সর্বতোভাবে ইতিবাচক ফলাফলের দিকে নির্দেশ করে, কারণ এটি প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলে। এই কারণেই যখন কোনো মানুষ শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করেন, সমস্ত প্রকৃতি জগৎ তার সমর্থনে এগিয়ে আসে। অপর দিকে, কোনো মানুষ যদি সহিংস পথ অবলম্বন করে, তাহলে সমস্ত প্রকৃতি জগৎ তার যাবতীয় প্রতিকূলতা নিয়ে তার বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শান্তির যুগের আবির্ভাব

একচেটিয়া অধিকারমোচনের যুগ

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করে পৃথিবী নামক গ্রহে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, সেই স্বাধীনতা আত্মনিয়ন্ত্রিত ভাবে মানুষ ব্যবহার করবে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তা করতে ব্যর্থ হল। রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভ, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা যেন নিয়ম হয়ে গেল। এই অবস্থা বহু হাজার বছর ধরে চলতে থাকল। বিগত শতাব্দীগুলিতে যুদ্ধের সংস্কৃতি প্রচলিত থাকার এটিই প্রধান কারণ।

এই অবস্থা ঈশ্বরের সৃষ্টিতত্ত্বের বিরোধী। এই সৃষ্টি তত্ত্ব অনুসারে, এটি বাঞ্ছনীয় ছিল যে প্রতিটি নারী ও পুরুষ একটি মুক্ত পরিবেশে নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পাবে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিকল্পনা অকার্যকর হয়ে গেল। তখন ঈশ্বর মানুষের স্বাধীনতা রক্ষা করে ইতিহাস ব্যবস্থাপনার চেষ্টা করলেন। এর জন্য অতি জটিল পরিকল্পনা প্রয়োজন ছিল। সেই কারণে লক্ষ্যে পৌঁছতে অত্যন্ত দীর্ঘ সময় লাগল। বর্তমান যুগ সেই দৈব পরিকল্পনার চূড়ান্ত পর্যায়।

পূর্ববর্তী সময়ে যে সীমিত সুযোগ পাওয়া যেত তার ফলে বহু জিনিসের উপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়েছিল: যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক সুযোগ এবং ধর্ম। প্রতিটি বিষয়ই কোনো না কোনো গোষ্ঠী কুক্ষিগত করে রেখেছিল। এই অবস্থায় ঈশ্বর চেয়েছিলেন জীবনের সমস্ত সম্পদকে এই একচেটিয়া অধিকার থেকে মুক্ত করে প্রতিটি নারী ও পুরুষকে নির্বাচনের স্বাধীনতা প্রদান করতে। ঈশ্বর এভাবেই ইতিহাসের ব্যবস্থাপনার একটি পদ্ধতি শুরু করলেন। আমাদের আধুনিক সভ্যতা ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার একটি চূড়ান্ত রূপ।

গণতন্ত্রের যুগ রাজনৈতিক ক্ষমতার একচেটিয়া অধিকার মোচন ঘটাল। আধুনিক শিল্পায়ন অর্থনৈতিক সম্ভাবনার ক্ষেত্রে এই একচেটিয়া অধিকার মোচনের ফল। আধুনিক যুগের বৌদ্ধিক মুক্তি ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের একচেটিয়া ক্ষেত্র থেকে মুক্তি সম্ভব করেছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাবের ফলে আদর্শগত কঠোর নিয়ন্ত্রণের থেকে মুক্তি সম্ভব হয়েছিল।

এই ঘটনাকে ব্রিটিশ লেখক জে এফ ওয়েস্ট একটি বৃহৎ বৌদ্ধিক বিপ্লব বলে আখ্যা দিয়েছেন [১]। সমস্ত রকম একচেটিয়া কারবারের বিকেন্দ্রীকরণের ফলে একটি শান্তির সংস্কৃতি গড়ে ওঠা অবশ্যম্ভাবী ছিল। একচেটিয়া অধিকারমোচনের পরে, সমস্ত জিনিস সকলের আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়েছে; যে কারণে কারো অভীষ্ট অর্জনের জন্য আর হিংসার আশ্রয় নেওয়ার কোনো দরকার নেই।

পূর্ববর্তী যুগগুলিতে, পছন্দের সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। এই অবস্থায় একমাত্রিক সংস্কৃতি তৈরী হয়। তখন মানুষ বিত্তশালী এবং সর্বহারাদের দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। মানুষের এই বিভাজন বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। এই কারণেই পূর্ববর্তী যুগগুলিতে মানুষরা ক্রমাগত হিংসা ও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তেন।

আধুনিক সভ্যতা জীবনের প্রায় সমস্ত সুযোগের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়েছে। প্রত্যেকের পক্ষে স্বাধীনভাবে তার পছন্দের ক্ষেত্রে সে যা চায়, তা অর্জন করার স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তাহলে, আমরা কেন দেখি যে আমাদের আধুনিক সভ্যতার আবির্ভাবের পরেও, কোনো কোনো অংশে যুদ্ধের সংস্কৃতি রয়ে গেল? এর কারণ হচ্ছে ইতিহাস এই পরিবর্তন সম্পর্কে অসচেতন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, কোনো ব্যক্তি যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে চায়, তাহলে তার যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। প্রাচীনকালে, কেবলমাত্র যুদ্ধের মাধ্যমে এবং শাসককে সিংহাসনচ্যুত করেই প্রশাসনে পরিবর্তন আনা সম্ভব হত। কিন্তু একটি গণতন্ত্রে নির্বাচনের শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শাসক দলের স্থান গ্রহণ করা সম্ভব। এই উন্নতিগুলির ফলেই বর্তমান যুগটি শান্তির যুগ হয়ে উঠেছে, কিন্তু এই যুগের সুযোগগুলি গ্রহণ করতে গেলে শিক্ষার প্রয়োজন। সেই কারণেই আমরা দেখি যে শিক্ষিত সমাজে নির্বাচনের শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির মাধ্যমে মসৃণভাবে সরকারের পরিবর্তন ঘটে; অপরদিকে অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত সমাজগুলিতে, যেখানে মানুষ আজও বাতিল হয়ে যাওয়া মানসিকতার কবলে আছেন, রাজনৈতিক শক্তির দখল নিতে মারামারি করতে হয়।

অর্থনৈতিক সুযোগ সম্ভাবনার জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। কৃষির উপর ভিত্তি করে আমাদের প্রাচীন অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল এবং একমাত্র অন্যের জমি হরণ করেই উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হত। আজ, শিল্পের একটি বৃহৎ ক্ষেত্র খুলে গিয়েছে এবং এই ক্ষেত্রের বিভিন্ন সুযোগ কাজে লাগিয়ে মানুষ সফল হতে পারে।

আধুনিক যুগে সম্পদের এই একচেটিয়া অধিকার থেকে মুক্তকরণ একটি বিরাট আশীর্বাদ, কারণ তা সহিংস পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক করে দিয়েছে। এখন শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সব কিছু অনেক বেশি মাত্রায় অর্জন করা যায় ।

একচেটিয়ার যুগের সমাপ্তি এবং একচেটিয়া মুক্ত করণের যুগের আগমনের ফলে হিংসার যুগ শেষ হল এবং শান্তির যুগের আবির্ভাব ঘটল।

একচেটিয়া মুক্তকরণের যুগ বাস্তবে যুদ্ধের সমস্ত অবকাশ বন্ধ করেছে। এখন কোনো রকম প্রয়োজন থেকে মানুষের যুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন ঘটে না, এখন যুদ্ধ কেবলমাত্র স্বাধীনতার অজ্ঞ অপব্যবহারের ফল।

পশ্চিমী সভ্যতা

কোরানের বহু আয়াতে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্পর্কে পূর্বাভাস আছে, যেমন, সাসানীয় পারস্যের বিরুদ্ধে রোমানদের জয়ের পূর্বাভাস (রোমানগণ, ৩০:১-২)। কোরানের কথা মত এই ভবিষ্যদ্বাণী দশ বছরের মধ্যে সিদ্ধ হয়। তবে মানব ইতিহাসের পরবর্তী পর্বে পশ্চিমী সভ্যতা, একটি মানববাদী সভ্যতার উত্থান সম্পর্কে কোরানে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তা আরও তাৎপর্যপূর্ণ:

'আমরা তাহাদিগকে এই ব্রহ্মাণ্ডে এবং তাহাদিগের নিজেদের মধ্যে আমাদের চিহ্নগুলি দেখাইব, যতক্ষণ না তাহাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে ইহাই সত্য' (৪১:৫৩)।

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় কোরান আসবার এক হাজার বছর পরে পশ্চিমী দেশগুলিতে যে উন্নতি দেখা যায়, তা আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। বাস্তবে পশ্চিমের সভ্যতা বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এর দুটি দিক আছে: প্রথমটি তত্ত্বগত এবং অন্যটি প্রায়োগিক দিক।

পশ্চিমী সভ্যতার প্রায়োগিক আঙ্গিকটিকে প্রযুক্তিগত আঙ্গিকও বলা যেতে পারে। এই আঙ্গিকটিই পয়গম্বরের ধারায় লক্ষ্য করা যায়;

'ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাঁর ধর্মকে ফাজির বা অবিশ্বাসীর সঙ্গেও সমর্থন করবেন।'[১]

এখানে ফাজির অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ। পয়গম্বরের এই উক্তি আসলে পশ্চিমী সভ্যতার আবির্ভাবের পূর্বাভাস। এই সভ্যতা মানবদরদী। অর্থাৎ এটি মানবজগৎ তথা দৈব ধর্ম উভয়ের পক্ষেই উপকারী।

পশ্চিমী বা আধুনিক সভ্যতা কোনো একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নয়। এর সবটাই লুক্কায়িত প্রাকৃতিক নিয়ম এবং প্রযুক্তির উন্নতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল যা সমগ্র মানবতার উপকার করেছিল, এবং আজও করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, প্রাকৃতিক নিয়মগুলি আবিষ্কারের ফলে যোগাযোগের একটি নতুন যুগ সূচিত হল। ইসলাম ধর্মাবলম্বী ও প্রচারক সহ প্রত্যেকেই তার দ্বারা উপকৃত হলেন।

পশ্চিমী সভ্যতার বিবর্তনের দুটি দিক আছে। এর একটি হল সামাজিক ও রাজনৈতিক জগতে ঘটে যাওয়া বৌদ্ধিক বিপ্লব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, গণতন্ত্রের দ্বারা রাজতন্ত্রকে পরিবর্ত্তিত করা একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগামী পদক্ষেপ ছিল। অপর দিকটি ছিল যোগাযোগের আধুনিক মাধ্যমের উপকারিতা সংক্রান্ত। এর ফলে মানুষ ভূগোলের সম্যক জ্ঞান লাভ করে এবং স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রমণ সহজ হয়ে যায়। সমগ্র বিশ্বে ভাবনাচিন্তা সঞ্চারিত করার কাজে ছাপাখানার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বৈদ্যুতিন প্রযুক্তি তো গোটা বিশ্বকে একটি বৃহৎ গ্রামে পরিণত করেছে। বিশ্বের এক প্রান্তে বসে কথা বললে অপর প্রান্তে বসে তা দেখা এবং শোনা আজ সম্ভব হয়েছে।

আধুনিক উন্নতির সবথেকে বড় উপকারিতা এই যে মানব ইতিহাসে এই প্রথম শান্তির যুগ সূচিত হয়েছে। মানুষের ইতিহাসের পূর্ববর্তী যুগগুলিতে যে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করতে হত। সমস্ত সিদ্ধান্ত যুদ্ধক্ষেত্রেই নেওয়া হত এবং এই কারণে, তাদের নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে ওঠার আগেই বহু মানুষকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হত। আধুনিক উন্নতির ফলে, মনুষ্য ইতিহাসে প্রথমবার সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে নিজস্ব লক্ষ্য, ছোট বা বড়, অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

দীর্ঘ পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা মনুষ্য ইতিহাসে একটি বিপ্লবের সূচনা করলেন, যার ফলে যুদ্ধের যুগ শেষ হল। এই ভাবে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সমস্ত অভীষ্ট অর্জন করা সম্ভব হল এবং এটি সহিংস পদ্ধতির থেকে অনেক ভালো, কারণ সহিংস পদ্ধতিতে কোনো মূল্যের কোনোকিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়।

আধুনিক যুগের এটিই শ্রেষ্ঠতম অর্জন। আজকের যুগে যারা যুদ্ধ ও হিংসার পদ্ধতি অবলম্বন করে, তারা প্রমাণ করে যে তারা ইতিহাসের আধুনিক উন্নতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই চূড়ান্ত অজ্ঞতা তাদের অনিয়ন্ত্রিত অস্ত্রব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। হিংসার পথ অবলম্বন করে তারা ইতিহাসের নিকৃষ্টতম অপরাধ করেছে।

এমতাবস্থায়, একবিংশ শতকে যারা শান্তির পদ্ধতি ত্যাগ করে বন্দুক ও বোমার কৌশল অবলম্বন করে, তারা এই কথা প্রমাণ করে যে তারা নিজেদের এবং অন্যদের জন্য একটি ধ্বংস ও মৃত্যুর ইতিহাস রচনা করছে। এর পরবর্তীতে কোরানের এই সুরাটি তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে:

"তোমাদিগের মধ্যে যাহারা এইরূপ কার্য করিবে তাহারা পৃথিবীতে অসম্মান দ্বারা পুরস্কৃত হবে এবং পুনরুত্থানের দিনে তাহারা কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে" (২:৮৫)।

বিকল্প সমূহের যুগ

প্রাচীন কালে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষদের জন্য উচ্চাশা পূরণের মাত্র একটিই ক্ষেত্র ছিল, যুদ্ধক্ষেত্র। কিন্তু আধুনিক যুগে এক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। এখন আমরা বিকল্প সমূহের যুগে বাস করছি। যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ছাড়াও আমাদের সামনে অনেকগুলি বিকল্প আছে।

একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষের জন্য অনেকগুলি শান্তিপূর্ণ বিকল্প আছে। পূর্বে মানুষ যুদ্ধ থেকে যে ধরনের ফললাভের আশা করত এখন শান্তিপূর্ণ বিকল্পগুলির সাহায্যে তার থেকে অনেকগুণ বেশি ফললাভ করা সম্ভব। এই বিষয়টি প্রাঞ্জল করার জন্য আমি দুটি সমান্তরাল উদাহরণ দিতে চাই।

ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য ছিল বংশানুক্রমিক। ঔরঙ্গজেব (১৬১৮ - ১৭০৭) ছিলেন এই বংশের ষষ্ঠ সম্রাট। তিনি এবং তাঁর ভাই, দারা শিকোহ (১৬১৫-১৬৫৯)-র উদ্দেশ্য ভিন্ন ছিল। সে সময় পার্থক্য নিরসনের একটাই পথ ছিল - যুদ্ধ। সুতরাং একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে দারা শিকোহ্ এবং তাঁর অনুগামীরা পরাজিত হন ও মৃত্যুবরণ করেন।

বর্তমান কালে সেই একই ভারতবর্ষে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল আছে, কংগ্রেস ও বিজেপি। এই দুটি দলেরও উদ্দেশ্য ভিন্ন। যেহেতু ভারতবর্ষ এখন একটি গণতান্ত্রিক দেশ, দুটি দলই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকে; এবং এই পদ্ধতিটি কার্যকরী। এই ভাবে ২০১৪ সালের মে মাসে সাধারণ নির্বাচনের পরে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতৃত্বে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন ঘটল।

প্রতিটি দেশেই এই বিকল্পের সুযোগ আছে, এমনকি সেই দেশগুলিতেও, যেখানে কিছু গোষ্ঠী প্রবল হিংসার পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। আমরা প্রতিদিন সেই দেশগুলি থেকে রক্তপাতের খবর পাই।

সময় কিভাবে পাল্টেছে নেতারা তার খবর রাখেন না; সেই কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত দেশে যে নেতারা সহিংসতায় যুক্ত, তাঁরা এখনও পুরানো

মানসিকতার প্রভাবে আছেন। এই মানসিকতা অনুসারে, তাঁরা কেবলমাত্র রাজতন্ত্রের প্রাচীন আদর্শের সঙ্গে পরিচিত। তাঁরা বর্তমান গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত নন। যদিও এই ধরনের ভয়ানক সংঘর্ষের ফলাফলও ভয়ংকর, এই সমস্ত নেতাদের চিন্তনের মূলধারা এত গভীর প্রোথিত যে তাঁরা নিজেদের কৌশল সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করতে অক্ষম। সাম্প্রতিক কালে এমন বহু নেতা হিংসার শিকার হয়েছেন, যেমন সাদ্দাম হুসেন (মৃত্যু ২০০৬), আবু বকর আল-বাগদাদি (মৃত্যু, ২০১৪, প্রতিষ্ঠিত নয়) এবং আবু আলা আল-আফরি (মৃত্যু, ২০১৫)।

বিকল্পসমূহের যুগের আগমন খুবই ইতিবাচক একটি চিহ্ন। এর অর্থ এই যে ইতিহাস যুদ্ধ থেকে শান্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। একবিংশ শতকে এই যুগ তার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এখন বন্দুক আর বোমার সংস্কৃতিতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কোনো ব্যক্তি যদি তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায়, তাহলে তাকে যুগের স্বরূপটি প্রথমে অনুধাবন করতে হবে। কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগে সম্পূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকা উচিত। যদি তিনি একটি নিরপেক্ষ মননের অধিকারী হন, তিনি নিশ্চয় এই তথ্যটি বুঝবেন যে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠতর উপায় হতে পারে।

আধুনিক তুরস্ক এই রকম একটি উদাহরণ। উনিশ শতকের শেষের দিকে তুরস্ক ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। বর্তমান প্রায় তিরিশটি দেশ সেই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, এই ওসমানীয় সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে এবং তুরস্কের রাজনৈতিক বিস্তার বন্ধ হয়।

সাম্রাজ্যের পতনের পরে, আধুনিক তুরস্কের নেতারা কিছু কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং রাজনৈতিক বিস্তারের একটি বিকল্পের সন্ধান করেন - এটি ছিল তাঁদের দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ। এর ফলে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে, মুসলিম বিশ্বে সর্বাধিক অগ্রগণ্য রাষ্ট্ররূপে তুরস্কের আবির্ভাব ঘটে।

বর্তমান কালে মুসলমানরা একটি রাজনৈতিক দ্বিধার মধ্যে বাস করছে, অর্থাৎ এমন একটি অবস্থায় যেখানে শাসক ও শাসিতের বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। তারা নিজেদের 'শাসিত' পর্যায়ে আবিষ্কার করেছে, এটি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই তারা অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজেদের 'শাসক' পর্যায়ে ফিরিয়ে আনতে চায়।

কিন্তু চিন্তনের এই দ্বৈধতা সম্পূর্ণ অবাস্তব। তারা এ বিষয়ে সচেতন নয় যে তাদের সামনে একটি তৃতীয় বিকল্প আছে, তার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। এই বিকল্পটি এত মহান যে, এটি ব্যবহার করে তারা নিজেদের জন্য একটি অরাজনৈতিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারে।

আসল সমস্যা এই যে বর্তমান কালের মুসলমানরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ যে এটি গণতন্ত্রের যুগ। এই যুগে সরকারের একমাত্র দায়িত্ব প্রশাসনিক। কিন্তু প্রশাসনের বাইরে মুসলমানদের জন্য আরো অনেক বড় ক্ষেত্র খোলা আছে। যেমন, শিক্ষা, সংবাদমাধ্যম, অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম, অর্থনীতি ও দাওয়াহ্ কর্ম অর্থাৎ মানুষের কাছে ঈশ্বরের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাজ। এখন মুসলমানদের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ত্যাগ করে এই অরাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে মনোনিবেশ করা উচিত। এইভাবে তারা স্বাধীন বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারে, যা পূর্বতন রাজনৈতিক সাম্রাজ্যের থেকে অনেক বড়।

এ কথা সত্য যে বর্তমান যুগে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিকল্পের বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছে। নারী হোক বা পুরুষ, দক্ষ বা অদক্ষ, রাজনৈতিক নেতা বা সংস্কারক: এই নীতি সফল ভাবে সকলের জন্য প্রযোজ্য। এখন নিরাশাবাদের কোনো অবকাশ নেই; প্রতিবাদ, হিংসা বা সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, সকলেই সহজে জানতে পারে যে তার জন্য একটি বিকল্প অপেক্ষা করে আছে এবং তার সদ্ব্যবহার করে সে জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে পারে।

বর্তমান যুগে, 'সশস্ত্র সংঘর্ষ', এই শব্দ সমষ্টি অভিধানে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এর আর কোনো অর্থ নেই। অন্যান্য অপ্রচলিত শব্দাবলীর মত, 'সশস্ত্র সংঘর্ষ' ও অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছে। এখন যুদ্ধ ও হিংসার কথা বললে তা কাল-অসঙ্গত হবে।

বর্তমান বিশ্বে 'মারামারি' একটি অপ্রচলিত ধারণা। যদি বর্তমান যোদ্ধা এবং সশস্ত্র সংগ্রামীরা এই বিষয়ে অবগত হতেন, তাঁরা নিশ্চয় তাঁদের অস্ত্রগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। সেই সমস্ত অস্ত্রের স্থান হত সংগ্রহশালায়।

সভ্যতার যুগ

প্রাচীন সমাজের সংস্কৃতির একটি অবশিষ্ট উপাদান, হিংসা। প্রথমদিকে মানুষ কেবলমাত্র হিংসার মাধ্যমেই নিজের সমস্যা সমাধানের উপায় জানত। এ কথা বলা হয় যে প্রস্তর যুগের কোনো এক পর্যায়ে দুজন মানুষ ঝগড়া শুরু করার পরে পরস্পরের দিকে ক্রোধে পাথর ছুঁড়তে থাকে। দুটি পাথরের সংঘর্ষের ফলে আলোর ফুলকি বিচ্ছুরিত হয়। দুজন মানুষই সেটা লক্ষ্য করে। তারা নিজেদের ঝগড়া ভুলে বিচ্ছুরণের প্রণালী বিষয়ে ভাবতে বসেছিল। এই অভিজ্ঞতা থেকে তারা আবিষ্কার করেছিল যে পাথরের মধ্যে কিছু বিষয় লুক্কায়িত আছে যা পাথরের থেকে আলাদা। সেটা এই যে পাথরের নিজস্ব কোনো আলো নেই, কিন্তু তাদের সংঘর্ষের ফলে আলো সৃষ্টি হয়। পাথর কঠিন, কিন্তু এই বিচ্ছুরণটি নরম, ইত্যাদি। বলা হয় যে এই সমস্ত ঘটনার ফলেই প্রাকৃতিক নিয়মগুলির অনুসন্ধান শুরু হয়।

প্রকৃতিতে সুপ্ত নিয়মগুলি আবিষ্কার করে এবং সেগুলি বুঝে প্রকৃতির ক্ষমতাকে নিজেদের প্রয়োজনমত নিজেদের উপকারার্থে ব্যবহার করতে মানুষের হাজার হাজার বছর সময় লেগেছে ।

বাষ্পশক্তির আবিষ্কার প্রকৃতির সুপ্ত ক্ষমতার প্রকাশের অন্যতম উদাহরণ। অনুরূপভাবে, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করে মোটর গাড়ি এবং বিমান তৈরি করা হয়েছে।

এইভাবে দীর্ঘসময় অতিবাহিত হওয়ার পরে বস্তুকে প্রযুক্তিতে পরিণত করা সম্ভব হল। নিরবচ্ছিন্নভাবে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে, মানবতার একটি বৃহৎ অংশ এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। চাকার আবিষ্কার ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির দুটি পর্বের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান ছিল। আধুনিক সভ্যতায় এই সময়ের বহু আবিষ্কারের একটি গভীর প্রভাব আছে এবং এর ফলে মানবজীবনধারায় সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে।

সভ্য পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি কষ্টের পর্ব পেরিয়ে মানুষের জন্য একটি আরামপ্রদ জীবনের সম্ভাবনা সূচিত করেছে। আধুনিক শহরগুলিতে সুযোগসুবিধা ও পরিবেশের ফলে এই ধরনে জীবনযাত্রা সম্ভব হয়েছে।

সব দিক দিয়ে আধুনিক সভ্যতা মানুষকে একটি আরামপ্রদ জীবন দিয়েছে - আরামপ্রদ যাত্রা, সুবিধাজনক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং যথোপযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ। সংক্ষেপে, জীবনের সমস্ত কাজই আরামপ্রদ এবং সুবিধাজনক হয়ে গিয়েছে।

আধুনিক সভ্যতার উন্নতির ফলে আধুনিক জীবনযাপনের সমস্ত ক্রিয়াকর্মে সুবিধা ঘটেছে। একজন মানুষ, তিনি বাড়িতে থাকুন বা অফিসে, কিংবা যাত্রাপথে, তিনি একটি আরামপ্রদ জীবন উপভোগ করেন। আজ একটি সভ্য জীবনের অর্থ সুখকর আরামপ্রদ জীবন।

সভ্যতার যুগের উল্লেখযোগ্য অবদান এই যে তা যুদ্ধের যুগের অবসান ঘটিয়েছে। যুদ্ধ এবং হিংসা আজ এত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে যে তা প্রায় রান্নাঘরে দেশলাই বা লাইটার ব্যবহার না করে চকমকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালার সামিল।

আজকাল রান্নাঘরে আগুন জ্বালবার জন্য কেউ সেকেলে অপ্রচলিত পদ্ধতি ব্যবহার করে না। কিন্তু আমরা দেখি যে, আজ পর্যন্ত নিয়মিত ভাবে হিংসা ও যুদ্ধের পথ অবলম্বন করা হয়, যদিও এটি সম্পূর্ণরূপে অসভ্য উপায়, একমাত্র প্রাচীন কালেই যার কিছু তাৎপর্য ছিল।

তাহলে এটি কেন যে, এই সভ্যতার যুগেও যুদ্ধের পথ গ্রহণ করা হয় এবং তা সম্পূর্ণ ত্যাগ করা হয় নি? তার কারণ এই, যদিও মানুষ সফলভাবে বস্তুকে প্রযুক্তিতে পরিণত করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, সে পার্থক্য ব্যবস্থাপনার শিল্প আবিষ্কার করতে বিফল হয়েছিল। পার্থক্য ব্যবস্থাপনা শিল্প আজও একটি অপরিণত বিজ্ঞান।

পার্থক্য প্রকৃতির অঙ্গ। ব্যক্তির বৌদ্ধিক উন্নতির ক্ষেত্রে পার্থক্য একটি উৎসাহব্যঞ্জক উপাদান। যদি কোনো পার্থক্য না থাকে, বৌদ্ধিক উন্নতিরও সুযোগ থাকবে না। অতএব পার্থক্য কোনো অশুভ বিষয় নয়। আসল সমস্যার জন্ম হয় যখন আমরা পার্থক্য ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থ হই।

পার্থক্য ব্যবস্থাপনার শিল্প কী? শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে পার্থক্য সংক্রান্ত সমাধান। প্রকৃতির বিভিন্ন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনই পার্থক্য বিষয়ে যুক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন।

পার্থক্য চিরকালই মানবজীবনের অঙ্গ ছিল। প্রাচীনকালে মানুষ বিরোধ এবং সংঘর্ষের মাধ্যমেপার্থক্য নিরসন ও সমস্যার সমাধান করতে চাইত - এটি ছিল বর্বরোচিত পদ্ধতি। পার্থক্য ব্যবস্থাপনার সুসভ্য উপায় হল যে কোনো পার্থক্যের ক্ষেত্রে যুক্তির প্রয়োগ এবং শান্তিপূর্ণ কথোপকথনের মাধ্যমে একটি সমাধানে পৌঁছানো।

সভ্যতার যুগ এখনও অসম্পূর্ণ। এ পর্যন্ত তা আমাদের একমাত্র বস্তুগত সুখ দিয়েছে। অর্জনের এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে, এবং তা হল সভ্য উপায়ে শান্তিপূর্ণভাবে পার্থক্য নিরসন করা। যেদিন মানুষ শান্তিপূর্ণভবে পার্থক্য বিষয়ে সমাধানে পৌঁছে যাবে, সেদিন সভ্যতার যুগ তার শীর্ষে উপনীত হবে।

সভ্যতার পথে যাত্রা

অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ থেকে হিংসার জন্ম হয়। মানুষের জীবনে প্রায় প্রতিনিয়তই অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা ঘটে: এটি আমাদের জীবনের অঙ্গ এবং অধিকাংশ মানুষের মধ্যে এর ফলে একধরনের অবদমিত ক্রোধের জন্ম হয়। এবং তারপরে কোনো উত্তেজক অবস্থার সৃষ্টি হলে, এই ক্রোধ হিংসা, এবং কখনও কখনও যুদ্ধ হয়ে জ্বলে ওঠে। এই সমস্যার একটি চিরস্থায়ী সমাধান চাইলে ক্রোধের বন্যাকে নিয়ন্ত্রিত করার একটি কার্যকরী উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

তার শ্রেষ্ঠ উপায় হল মানবতার ঐতিহাসিক অবদান মনে রাখা। এই উপলব্ধি হিংসাকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি যথার্থ উপায়।

বর্তমানে আমরা একটি সভ্য জগতে বাস করছি; আমরা বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করি। কিন্তু এই সমস্ত সুযোগ মানব ইতিহাসের প্রথম দিকে উপলব্ধ ছিল না। সেগুলি এল কিভাবে? এটি উন্নতির একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার শেষতম ফল। প্রাচীন মানুষ খুবই কষ্টসাধ্য জীবন যাপন করত। ঐতিহাসিকেরা এই যুগকে বলেন প্রস্তর যুগ। সে যুগে সমস্ত কিছুই অপরিণত অবস্থায় ছিল। তারপর মানুষ উন্নতির পথে এক দীর্ঘ যাত্রা শুরু করল। প্রথমে সে ঘোড়ায় চড়তে শিখল, তারপরে চাকা আবিষ্কার হল এবং শেষ পর্যন্ত এক দীর্ঘ গবেষণাপথ পেরিয়ে সে প্রযুক্তি গড়ে তুলল। এর ফলে ক্রমে মানুষ মোটরগাড়ি ও বিমানে যাত্রা করতে শুরু করল। এইভাবে মানুষ সুখসুবিধার অপরিণত উপকরণ থেকে আধুনিক প্রযুক্তির দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছাল। এটি একটি দীর্ঘ যাত্রা ছিল; সে যাত্রা সভ্যতার, এবং তাতে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সমস্ত মানবতা যুক্ত ছিল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষ বহু আত্মত্যাগ করেছিল। এমন কিছু জিনিস যা সকলের কাজে লাগে, সেগুলি গড়ে তুলতে মানুষ তার উৎসাহ ও সময় ব্যয় করেছে, এইভাবে মানুষ এক সভ্যতার বাগান সৃষ্টি করেছিল; আজ সকলে তার ফল ভোগ করছে। তাই আমরা সমগ্র মানবতার কাছে ঋণী।

এটিই বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভিত্তি। 'প্রতিবেশীকে ভালোবাসা' একটি ভালো বিধান। কিন্তু বাস্তব জীবনে এই বিধান অনুসরণের কিছু যুক্তিবাদী ভিত্তি থাকা প্রয়োজন। মানুষ

স্বভাবতই যৌক্তিকতা খোঁজে। প্রতিটি কাজের জন্য তার যুক্তির প্রয়োজন হয়, এমনকি অন্যদের প্রতি প্রেম ও করুণা প্রদর্শনের জন্যও। সভ্যতার বিবর্তনের যে ধারণার কথা আগে বলা হয়েছে, সেটিই এই ধরনের ভাবনার পিছনে একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে।

একজন মানুষ সর্বদা চেষ্টা করে তার পিতামাতার সঙ্গে বিরোধে না যেতে, কারণ সে তার জীবনে তার পিতামাতার অবদান সম্পর্কে সচেতন। মানুষ তার বাবা মায়ের অবদান সম্পর্কে সচেতন, কিন্তু তার জীবনে বৃহত্তর মানবতার অবদান সম্পর্কে সচেতন নয়।

যদি মানুষ বৃহত্তর মানবতার এই অবদান সম্পর্কে সচেতন হত, তাহলে সে এই মানবতাকে তার পিতামাতার থেকেও বেশি ভালোবাসত, এবং কখনই মানবতাকে নিজের প্রতিপক্ষ বলে ধরে নিত না। অন্যদের সঙ্গে প্রতিপক্ষতার এই ভাব থেকেই হিংসার সৃষ্টি হয়। যদি এই প্রতিপক্ষতার অবসান ঘটে, তাহলে কখনই কেউ হিংসার আশ্রয় নেবে না।

মানুষ যেহেতু যৌক্তিকতা সন্ধানকারী প্রাণী, তারা যৌক্তিকতা ছাড়া কিছুই করে না। যদি মানুষ তাদের জীবনে মানবতার ঐতিহাসিক অবদান সম্পর্কে অবহিত হত, তাহলে সেটিই যৌক্তিকতা রূপে কাজ করত এবং মানুষ কখনই অন্যদের সঙ্গে প্রতিপক্ষতার পন্থা অবলম্বন করত না। তারা তখন 'সকলকে ভালোবাসো' এই নীতি গ্রহণ করত। এটিই সামাজিক শান্তির যথার্থ বৌদ্ধিক ভিত্তি।

বিপণিকেন্দ্রগুলিতে আজ আমরা যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য কিনতে পাই, বাড়ির মধ্যে এবং বাড়ির বাইরে যাত্রাকালে যে সমস্ত সুযোগসুবিধা আমাদের জীবনকে আরামপ্রদ করে তোলে, সেগুলি বর্তমান গ্রাহকরা তৈরি করেন নি। একটি দীর্ঘ সময় ধরে সেগুলি মানবতার দ্বারা নির্মিত হয়েছে। সেগুলির উৎপত্তি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে আমরা সেগুলি ব্যবহার করে থাকি। আমরা যদি মনে করি সেগুলি মানবতার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য উপহার, তাহলে আমরা অন্যদের উপকারী মিত্ররূপে দেখব, প্রতিপক্ষ হিসাবে নয়। অন্যদের প্রতি আমাদের সমস্ত নেতিবাচক মনোভাব লোপ পাবে। তাদের প্রতি সহমর্মিতার এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা নিয়ে বাঁচতে পারব। এই রকম চিন্তনের ফলে সমস্ত নেতিবাচক ভাবনা, যা 'আমরা এবং ওরা'-র ধারণা গড়ে তোলে, তা নির্মূল হবে।

একজন ব্যক্তি যিনি এইভাবে বিষয়গুলি দেখেন, ক্রমে উপলব্ধি করবেন যে তাঁর অস্তিত্ব বিষয়ে সমগ্র মানবতার একটা ভূমিকা আছে। এতদিন পর্যন্ত তিনি এই ভ্রমের

মধ্যে বাস করছিলেন যে তাঁর জীবনে একমাত্র তাঁর পরিবারের অবদান আছে। এখন তিনি বুঝতে পারবেন তাঁর জীবনে মানবতার একটি বৃহত্তর ভূমিকা আছে। তিনি বুঝতে পারবেন মানবতার অবদান না থাকলে, তিনি কিছুই নন।

প্রতিটি ব্যক্তির তার নিজের পরিবারের সদস্যদের প্রতি এক গভীর মমতা থাকে। কিন্তু তিনি যদি এই বিশ্বায়িত চিন্তন গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে তাঁর মনে সমগ্র মানবতার জন্য এক গভীর মমতা সঞ্চারিত হবে। তিনি যীশুখ্রীষ্টের 'তোমার শত্রুকে ভালোবাসো', এই বাণীর যাথার্থ উপলব্ধি করবেন, যা আসলে "সকলকে ভালোবাসো, কারণ সকলেই তোমার উপকারী মিত্র, কোনো শত্রু নেই।"

শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা সাধন

২০১১ সালে আমার আমেরিকা যাত্রার একটি পর্বে, ফিলাডেলফিয়ার একটি চার্চ থেকে শান্তির গুরুত্বের উপর একটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমার বক্তব্য শেষ হয়ে যাওয়ার পর, এক খ্রীষ্টান পন্ডিত আমাকে প্রশ্ন করলেন: "বাইবেলে একটি সুপরিচিত শিক্ষা আছে 'তোমার শত্রুকে ভালোবাসো'।[১] আপনি কি কোরান থেকে অনুরূপ কোনো উদ্ধৃতি দিতে পারেন?" আমি বললাম, হ্যাঁ, আপনি কোরানের ৪১তম সুরা (অধ্যায়ের) ৩৪ নম্বর আয়াত (শ্লোক) টি পাঠ করতে পারেন। আয়াতটির অনুবাদ এই রকম:

"ভালো এবং মন্দ কর্ম সমান নয়। মন্দ কাজের প্রতিদানে তুমি ভালো কাজ কর; তাহলে দেখবে, যে একদিন তোমার শত্রু ছিল তোমার নিকটতম বন্ধু হয়ে উঠেছে।" (৪১:৩৪)

কোরানের এই আয়াতটি প্রকৃতির নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, কোনো চিরস্থায়ী বন্ধু বা চিরস্থায়ী শত্রু নেই। মানুষকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়; যারা যথার্থ বন্ধু এবং যারা সম্ভাবনাপূর্ণ বন্ধু। আমাদের এই তথ্যটি আবিষ্কার করতে হবে এবং সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্ভাবনাকে যাথার্থে পরিণত করতে হবে।

যারা জিহাদের নামে হিংসায় লিপ্ত, তারা সমস্ত জিনিসকে আপাত মূল্যে গ্রহণ করে। অর্থাৎ যদি কাউকে শত্রু বলে মনে হয়, তারা তৎক্ষণাৎ তাকে শত্রু বলে ঘোষণা করে এবং তার বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু করে। কোনো বিষয়ের গভীরে যেতে না পারার এটি একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু যদি তারা গভীরভাবে বিষয়গুলিকে দেখে, তাহলে তারা বুঝবে যে তারা যাদের শত্রু বলে চিহ্নিত করেছে, তাদের মধ্যেই প্রিয়তম বন্ধু হওয়ার বহু সম্ভাবনা ছিল। অতএব তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে শান্তিপূর্ণ দাওয়াহ্ কর্মের মাধ্যমে, ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দিয়ে তাদের বন্ধু করে নেওয়া যেত।

প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে সমস্ত নারী ও পুরুষ আদম এবং হাওয়ার সন্তান। অর্থাৎ, সমস্ত মানবেরই একজন সাধারণ পূর্বপুরুষ আছে। এর অর্থ এই যে সমগ্র মানবসমাজ বিশ্বব্যাপী এক অখন্ড পরিবার। সমস্ত নারীপুরুষের মধ্যে রক্তসম্পর্কের এক ভ্রাতৃত্ববন্ধন আছে। বর্তমান কালে জীববিদ্যা সম্পর্কিত এই প্রপঞ্চ একটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য। বর্তমানে এটি আর কেবলমাত্র আদম ও হাওয়ার রহস্যজনক গল্প মাত্র নয়। এটি নৃতত্ত্বীয় গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বিষয়[২]।

জীববিদ্যা সম্পর্কীয় এই তথ্যটি গ্রহণ করলে অন্তত তত্ত্বগতভাবে সমস্ত নারীপুরুষের পক্ষে একটি বিশ্বপরিবার রূপে বাস করা সম্ভব, প্রতিপক্ষরূপে নয়। এখন আর মানবসমাজে উপজাতীয়, জাতীয় বা অন্য কোনো রকম যুদ্ধের যৌক্তিকতা নেই।

একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মারামারি শুরু হয়েছে, এমন কথা আমরা কম শুনি। তত্ত্বগতভাবে, এটি সমস্ত মানবতার জন্যই সত্য হওয়া উচিত, কারণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুসারে, সমস্ত মানবতা একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত; অতএব সমস্ত পুরানো শত্রুতার অন্ত হওয়া উচিত। শান্তিতে বসবাস আর কেবলমাত্র একটি নৈতিক তত্ত্ব নয়। এটি একটি জীবনধারা, বৈজ্ঞানিক চর্চার মাধ্যমে যার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমান যুগের বিজ্ঞানী মহল বহু প্রাচীন তত্ত্বকে ত্যাগ করেছে। যেমন, সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বটি পূর্বের ভূকেন্দ্রিক তত্ত্বকে প্রতিস্থাপিত করেছে। যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কেও একই দৃষ্টিভঙ্গী প্রযোজ্য। বর্তমান ঘটনা সমূহ এবং বিজ্ঞানসম্মত চিন্তনের একটি বাস্তববাদী পর্যালোচনা দাবি করে যে মানুষ হিংসার পথ ত্যাগ করে তাদের একমাত্র সম্ভাব্য কার্যপ্রণালী রূপে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি গ্রহণ করবে।

একই সাধারণ বংশ থেকে উদ্ভুত হওয়ার সত্যতা চিরকালের জন্য 'আমরা এবং ওরা'-র সমীকরণের সমাধান করে দিয়েছে। এখন একমাত্র বলবৎ সমীকরণটি 'আমরা এবং আমরা', এই ধারণার উপর গড়ে উঠেছে। যুদ্ধের সূচনা, অতএব, কোনো বাইরের গোষ্ঠী নয় নিজের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সামিল। এখন যুদ্ধ একটি প্রাক-সভ্য যুগের ক্রিয়ারূপে পরিগণিত, আধুনিক সভ্যতার সূচক রূপে নয়। কোরানে এই বিশ্বজনীন সত্যটি বিধৃত আছে: 'যে কেউ একজন মানুষকে হত্যা করবে - হত্যার শাস্তিরূপে কিংবা দেশে দুর্নীতি প্রসারের অভিযোগ ব্যতীত - তা সমস্ত মানবতার হত্যা বলে পরিগণিত হবে; এবং যদি কেউ একজন মানুষের প্রাণ বাঁচায়, তা হলে তা সমস্ত মানবতার প্রাণরক্ষা রূপে পরিগণিত হবে' (৫:৩২)।

যুদ্ধের মাত্র একটিই গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক আছে: অপরকে হত্যা। যুদ্ধ আসলে গণহত্যার নামান্তর। এই অর্থে যুদ্ধ সবথেকে জঘন্য অপরাধগুলির অন্যতম। অন্য কথায় বলতে গেলে, যুদ্ধের অর্থ মানবতার হত্যা এবং শান্তির অর্থ মানবতাকে প্রাণদান।

পূর্ববর্তী যুক্তিগুলি থেকে একথা পরিষ্কার যে আমাদের সামনে একমাত্র পথ যুদ্ধের নয়, শান্তির।

একজন মানুষকে হত্যা করা আর একটি প্রাণীকে হত্যা করা এক কথা নয়। মানবতার একজন সদস্যকে হত্যা করা নিজেকে হত্যা করার সামিল। যদি কেউ এই বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন থাকেন, তাহলে তিনি কখনই অন্য মানুষদের নিজের সহিংস কর্মকান্ডের শিকার করবেন না। অজ্ঞতাবশতই একজন মানুষ অন্য একজনকে হত্যা করে। যদি এ বিষয়ে মানুষের সচেতনতার অভাব দূর করা যায়, তাহলে সমস্ত হিংসা নির্মূল করা সম্ভব হবে। হিংসা এবং যুদ্ধ প্রতিরোধ করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল বিশ্বজনীন শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

তৃতীয় অধ্যায়

শান্তির জন্য বিরোধহীন উপায়সমূহ

স্রষ্টার সৃষ্টিবিধান

আমরা এই বিশ্বের পরিকল্পনাকারী নই। এই বিশ্বপরিকল্পনা যে মনের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল, তা আমাদের মনের থেকে বহুগুণ শ্রেষ্ঠ। অতএব, সেই পরিকল্পনাকারীর মনে বিষয়গুলি যেভাবে বিন্যস্ত ছিল, আমাদের তাই অনুসরণ করা উচিত। না হলে আমাদের পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হবে।

শান্তি হল সেইরকম একটি প্রণালী যা অনুসরণ করে বিশ্বপরিকল্পনা ঘটেছে। শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করে, এমন কোনো কিছু নেই যা আমরা অর্জন করতে পারি না। অপর দিকে, শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি উপেক্ষা করলে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে বিফল হয়ে যাবে। এই বাস্তবের কথাই বলেছিলেন ইসলামের পয়গম্বর, হজরত মহম্মদ:

'ঈশ্বর শান্তিকে তাই প্রদান করেন যা তিনি কখনই হিংসাকে প্রদান করেন না।'[১]

এই ধারাটি আসলে প্রকৃতির নিয়মের একটি বক্তব্য। প্রকৃতির নিয়ম কোনো অর্থেই রহস্যজনক নয়: সব মানুষই তা অনুধাবন করতে পারে। প্রকৃতির নিয়ম এই যে জগতে কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিকল্পনাই ক্রিয়াশীল। সহিংস কোনা পরিকল্পনা কোনোভাবেই কাজ করবে না।

এই প্রাকৃতিক বিধির পিছনে যুক্তি এই যে, যখন কেউ শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করে, সে একটি সংঘাতহীন পথে যাত্রা করে। এর ফলে সে যাত্রা-পরিকল্পনা অনুসারে সামনে একটি পরিষ্কার রাস্তা দেখতে পায়। অপর দিকে, যখন কেউ হিংসার পথ অবলম্বন করে, তার যাত্রা সংঘাতে শেষ হয়। এক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে অপর দিক থেকে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এই রকম যাত্রা প্রকৃতির নিয়মের বিরোধী, অতএব তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সৃষ্টিকর্তার বিষয় বিন্যাস অনুসারে, প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব পছন্দ নির্বাচন করার জন্য স্বাধীন। এর অর্থ, জীবনের পথ একমুখী নয়। প্রতি মুহূর্তে, উল্টোদিক থেকে যানবাহন আসছে, তাই এই যানস্রোতের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, এই ক্ষমতা থাকতে হবে। যাত্রা-ব্যবস্থাপনার এই শিল্পকেই শান্তি বলা হয়।

এই অবস্থায় সাফল্য নিশ্চিত করতে হলে ব্যক্তির পরিকল্পনায় দ্বিমুখী কৌশল গ্রহণ করতে হবে; অর্থাৎ, একজনের ব্যক্তিগত অভীষ্ট লাভের চেষ্টার পাশাপাশি অন্যদের কাজের

সঙ্গেও সঙ্গতি রাখতে হবে। মনে হতে পারে এ যেন প্রায় দড়ির উপর হাঁটা, কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এটি সম্ভব।

এই জগতে মানুষ যেভাবে ইচ্ছা তার স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে পারে, কিন্তু সে সৃষ্টিকর্তার বিষয় বিন্যাস পরিবর্তন করতে পারে না। **মানুষের সামনে দুটিই পথ - সে দৈব পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে সফল হতে পারে, অথবা এর বিরুদ্ধে গিয়ে পরাজয়ের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।** এছাড়া কারো জন্য অন্য কোনো পথ নেই।

একজন মানুষ খুব গাছ পছন্দ করত। একদিন সে তার বাড়ির উঠোনে একটি পরিণত সবুজ বৃক্ষ দেখতে চাইল। সে মনে করল যদি সে একটি চারাগাছ লাগায় তবে তা গাছ হয়ে উঠতে অনেক সময় নেবে। সেই জন্য সে একটি বাগানে গিয়ে একটি পরিণত বৃক্ষ নির্বাচন করল। তারপর সে অনেকজন কর্মী নিয়োগ করে গাছটিকে শিকড়সুদ্ধ তুলে নিয়ে এসে নিজের বাড়ির উঠোনে পুঁতে দিল।

লোকটি ভারি খুশি হয়েছিল। সে নিজের মনে ভেবেছিল: 'আমি এক দিনেই একটি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছি। একটি বীজ বা একটি চারা রোপণ করলে তা একটি সময়সাপেক্ষ বিষয় হত এবং এখন আমি একটি সুন্দর সবুজ গাছ পাওয়ার দ্রুত পথ আবিষ্কার করেছি।'

কিন্তু পরদিন সকালেই সে যখন গাছটির দিকে তাকাল সে দেখল তার পাতাগুলি ঝরে পড়তে শুরু করেছে এবং কয়েকদিন পরে, পুরো গাছটাই শুকিয়ে গেল। স্বভাবতই সে অত্যন্ত হতাশ হয়েছিল। তার একজন বন্ধু তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে দেখল সে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে আছে। তার বন্ধু যখন তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করল, সে বলেছিল: 'আমি তাড়ায় আছি, কিন্তু ঈশ্বরের সে তাড়া নেই।'

এই কাহিনি আমাদের সামনে এ কথা প্রতিষ্ঠা করে যে প্রকৃতির নিয়মের বিরোধিতা করে সাফল্য পাওয়া যায় না। প্রকৃতির এই নিয়ম শুধু গাছেদের জন্য প্রযোজ্য নয়: এই নিয়ম বিশ্বজনীন। প্রতিটি ক্ষেত্রে সবাইকে এই স্বাভাবিক পথ অবলম্বন করতে হবে; তা না হলে কোনো যথার্থ লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

সন্ত্রাসবাদের সংস্কৃতির জন্যও একই নীতি প্রযোজ্য। যদিও সন্ত্রাসকর্মের প্রবক্তারা খুব সুন্দরভাবে নিজেদের যৌক্তিকতা উপস্থাপনের চেষ্টা করে, এই সংস্কৃতি সর্বদাই ব্যর্থ হবে। যে কোনো কাজে হাত দেওয়ার আগে প্রতিটি মানুষের একথা বিবেচনা করা উচিত যে তার কর্ম-পরিকল্পনা প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে সুসামঞ্জস্য কিনা। যদি তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে কর্ম সফল হবে; অন্যথায় বিফলতা নিশ্চিত।

পারস্পরিক হস্তক্ষেপহীনতার নীতি

মহাবিশ্বে তারার সংখ্যা প্রায় ১০০ অক্টিলিয়ন, অর্থাৎ দশকে উনত্রিশবার গুণ করলে যে সংখ্যা হয় তাই। মহাবিশ্বে গ্রহের সংখ্যা, দশ সংখ্যাটিকে প্রায় চব্বিশবার গুণ করলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায়, তার সমান। বিশাল মহাবিশ্বে এই অজস্র গ্রহতারা সর্বদা গতিশীল। কোটি কোটি বছর ধরে এই চলছে। যেমন, সূর্যকে কেন্দ্রে রেখে পৃথিবী সদা ঘূর্ণায়মান। তেমনই এই সৌর জগতের অন্যান্য গ্রহগুলি নিজ নিজ অক্ষপথে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে। বহু অযুত বৎসর ধরে, এই মহাজাগতিক গ্রহগুলি নিজেদের নির্দিষ্ট পথে চলেছে; এরা একে অপরের গতিতে হস্তক্ষেপ করে না, কোনো সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় না।

একথা সত্য যে মহাকাশে বহু সংঘর্ষ ঘটেছে। কিন্তু এই ঘটনাগুলি মহাকাশের উদ্দেশ্যপূর্ণ বিবর্তনের জন্যই পরিকল্পিত হয়েছিল। এই মহাবিশ্বের নিরন্তর বিবর্তন ও প্রসার ঘটছে। এই ঘটনাগুলি সর্বদাই সুপরিকল্পিত এবং একটি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য পূরণের নিমিত্ত ঘটে থাকে।

মহাবিশ্বের এই যে সুসংবদ্ধ ছন্দময়তা, পৃথিবী এবং চন্দ্রের প্রসঙ্গে কোরানে সে কথা আছে:

‘তিনি এই দিন এবং রাত সৃষ্টি করেছেন, এই সূর্য এবং চন্দ্র, সকলে (শান্তিপূর্ণভাবে) নিজ অক্ষপথে অবস্থান করছে’ (২২:৩৩)।

মহাকাশের সেই অনন্ত স্থানে পারস্পরিক হস্তক্ষেপহীনতার নীতির দ্বারা সম্পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। এটিই বৃহৎ জগতে সংস্কৃতি। একই সংস্কৃতি ক্ষুদ্র জগতেও লক্ষ্য করা যায়। বস্তুজগতের ক্ষুদ্র একক, পরমাণুর মধ্যেও একই সংস্কৃতি বিরাজমান।

একটি পরমাণুর মধ্যে আরো কিছু ক্ষুদ্র কণা আছে, যেগুলি সর্বক্ষণ চলমান, গতিশীল। কিন্তু সেখানে কোনো সংঘর্ষ নেই। তাই আমরা বলতে পারি যে আমরা বৃহৎ জগতে যে শান্তি দেখতে পাই, সেই শান্তি ক্ষুদ্র জগতেও আছে।

ক্ষুদ্র-বৃহৎ মিলিয়ে পৃথিবীতে সর্বসুদ্ধ প্রায় পঞ্চাশ কোটিরও বেশি প্রজাতির প্রাণি আছে। আবার প্রাণিজগতেও পূর্ণ শান্তি বিরাজ করে। প্রথম বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মত কোনো বড় যুদ্ধ প্রাণিজগতে সংঘটিত হয় নি। সমস্ত জীবন্ত প্রাণি বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকে। তাহলে কিভাবে সম্যক শান্তি সম্ভব? এর উত্তর এই যে প্রাণিরাও একই সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে - পারস্পরিক হস্তক্ষেপহীনতার নীতি। একমাত্র পার্থক্য এই যে বস্তুজগৎ প্রকৃতির নিয়মের প্রভাবে যা গ্রহণ করেছে, প্রাণিজগত তা সহজাত প্রবৃত্তিবলে গ্রহণ করেছে।

এই একই সংস্কৃতি, পারস্পরিক হস্তক্ষেপহীনতার সংস্কৃতি, মানব জগতেও প্রয়োজনীয়। **প্রতিটি মানুষ তার নিজের কাজকর্ম করার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন, সেক্ষেত্রে একমাত্র বাধা এই যে সে অন্য মানুষদের জন্য ক্ষতিকারক হয়ে উঠবে না।** অন্যভাবে বললে, মানুষকেও এই সংস্কৃতি, অর্থাৎ পারস্পরিক হস্তক্ষেপহীনতার নীতি অবলম্বন করতে হবে। এটিই প্রকৃতির নিয়মের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শান্তির একমাত্র ফর্মুলা।

পারস্পরিক হস্তক্ষেপহীনতার নীতি শান্তি নিয়ে আসে, এবং শান্তি সমস্ত সুযোগ সুবিধার দরজা খুলে দেয়। এই সুযোগসুবিধার সদ্ব্যবহার করে সকলে নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। অর্থাৎ, সকলেরই সুযোগ আছে। নিজের সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য এই হল প্রকৃতির নিয়ম। ইসলাম ধর্মও প্রকৃতির এই নিয়ম গ্রহণ করেছে। এখানে আমি দুটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতির কথা বলব।

হিজরা বা অভিবাসন (৬২২ খ্রীষ্টাব্দ)-এর পূর্বে হজরত মহম্মদ যখন মক্কায় ছিলেন, তখন কোরানের এই আয়াতটি আসে:

‘তোমার জন্য তোমার ধর্ম, আমার জন্য আমার (১০৯:৬)।

হিজরার পরে যখন পয়গম্বর মদিনায় বসবাস শুরু করলেন, তিনি এই নীতি দৃঢ় প্রতিপন্ন করলেন। সেই সময় মদিনাবাসী জনগণের মধ্যে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক ছিলেন ইহুদি, বাকি অর্ধেক মুসলমান। ‘মদিনা ঘোষণা’ নামে একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রচার করলেন হজরত মহম্মদ, তাতে বলা হয়েছিল; ***লিল-ইয়াহুদি দিনুহুম ওয়া লিল-মুসলিমিনা দিনুহুম***। এর অর্থ,

‘ইহুদিদের জন্য তাদের ধর্ম এবং মুসলমানদের জন্য তাদের নিজেদের ধর্ম’।[১] এই নীতি, অর্থাৎ পারস্পরিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি, একটি শাশ্বত নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মানবজগতের বাইরে তা ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত; মানব জগতেও এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

স্বর্গের মানুষরাও এই সংস্কৃতি গ্রহণ করবেন; কোরানে নিম্ন-উল্লিখিত বাক্যের দ্বারা তা প্রকাশ করা হয়েছে:

'এবং ঈশ্বর (তাদের) শান্তি সদনে আহ্বান করেন (১০:২৫)'।

পারস্পরিক হস্তক্ষেপহীনতার নীতি প্রতিটি নারী ও পুরুষকে অপরের অনিষ্ট না করে নিজের মত করে বাঁচার সুযোগ দেয়। শান্তি ও সমন্বয়ের শান্তি, এটিই একমাত্র ফর্মুলা।

পারস্পরিক হস্তক্ষেপহীনতা নিশ্চিত করে যে প্রতিটি মানুষ উন্নতির সমান সুযোগ পাবে। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এই সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একমাত্র পার্থক্য এই যে মানবজগতের বাইরে এটি প্রকৃতির নিয়মের অধীন; মানুষকে অবশ্য কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়াই নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছার বশে এই সংস্কৃতি গ্রহণ করতে হয়। মানুষ যে নির্বাচনগুলি করে তার মধ্যে তার চিন্তন জড়িয়ে থাকে। সেই কারণেই বৌদ্ধিক উন্নতির বিষয়টি একমাত্র মনুষ্যজগতে দেখা যায়, তার বাইরে নয়।

‘নিজেকে বাঁচাও’ ফর্মুলা

বাইবেল অনুসারে, যীশু খ্রীষ্ট বলেছিলেন:

যে তোমার কোটটা নিয়ে যায়, তার কাছ থেকে তোমার শার্টটাও বাঁচাবার চেষ্টা ক’র না। [১]

এর দ্বারা শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করার কথা বলা হচ্ছে না, বিচক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে। এই উক্তির মধ্যে একটি বহু মূল্যবান জ্ঞানসম্পন্নতার খন্ড আছে। এই নীতি মেনে জীবনে বিশাল সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

কোনো বিরোধের সময়, যখন তুমি তোমার শার্টটাও প্রতিপক্ষকে দিতে রাজি হয়ে যাও, তুমি তোমার সময় ও শক্তি বাঁচাতে পারো। এটি একধরনের ‘সময় কেনা’-র কৌশল। এটি বিচক্ষণ পরিকল্পনার একটি কৌশল।

শার্ট-টা আসলে কোনো ব্যাপার নয়। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে প্রতিটি অবস্থাতেই বিপুল সম্ভাবনার সুযোগ থাকে। যদি তুমি ‘শার্টের’ সমস্যায় জড়িয়ে পড় - অর্থাৎ কেউ তোমার শার্টটা চাইছে আর তুমি সেটা দিয়ে দিতে প্রস্তুত নও - তাহলে তুমি এই অবস্থার অন্যান্য আঙ্গিকগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন থাকবে। বিশেষভাবে, তোমার চারপাশে যে প্রচুর সুযোগ-সম্ভাবনা রয়েছে, তুমি সেগুলো দেখতেই পাবে না। এই রকম নেতিবাচক একটি বিষয়ে জড়িয়ে পড়ার কারণে তুমি তোমার ইতিবাচক চিন্তাধারা হারিয়ে ফেলবে।

একটি তুচ্ছ ‘শার্ট’-এর জন্য মারামারি করার থেকে অবশ্যই কর্মের আরো অনেক বড় বড় ক্ষেত্র আছে। এই রকম অবস্থায়, যদি তুমি তোমার মনকে নেতিবাচক সমস্ত কিছুর প্রভাব থেকে দূরে রাখতে পার এবং বিষয়টির দিকে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে তাকাও, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে আসল সমস্যা ‘শার্ট’টা তোমার হাতে রইল কিনা সেটা নয়; তোমার চারপাশের সম্ভাবনাগুলি তুমি কাজে লাগাতে পারলে কিনা, সেটাই প্রশ্ন।

যীশু খ্রীষ্টের এই উক্তিটি বিশ্বজনীন প্রয়োগের একটি আপ্তবাক্য। সমস্ত পয়গম্বররাও কোনো না কোনো ভাবে এই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি সফল হয়েছিল।

যেমন, ছিল হজরত মহম্মদের আদি বাড়ি ছিল প্রাচীন মক্কায়। সেই সময় মক্কার নেতারা তাঁকে সেই শহর ত্যাগ করে অন্যত্র বাস করতে বাধ্য করেছিলেন। পয়গম্বর মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় বাস করতে গেলেন। একটি অন্যায় দাবির মুখে এটি ছিল তাঁর শার্ট -টি দিয়ে দেওয়ার মত ঘটনা। কিন্তু পয়গম্বর অস্ত্যর্থক মনোভাব নিয়েই এই ঘটনা গ্রহণ করেছিলেন। মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় তিনি বলেন:

আমাকে এমন একটি শহরে চলে যেতে বলা হল যেটি (ভবিষ্যতে) অন্য সব শহরকে গ্রাস করবে। [২]

একথার তাৎপর্য ছিল এই যে: ‘এই বিষয়ে আমি যদি মক্কার নেতাদের সঙ্গে লড়াই করি, তাহলে তা আমার সময় ও শক্তির অপচয় ঘটাবে। কিন্তু যদি আমি মক্কা ত্যাগ করে অন্য কোনো শহরে গিয়ে বাস করি, তাহলে আমার লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে শান্তির সঙ্গে সবটা পরিকল্পনা করার জন্য আমার হাতে যথেষ্ট সময় থাকবে।’

তাইপয়গম্বর বিনা প্রতিবাদে, নিঃশব্দে মক্কা ছেড়ে গিয়ে মদিনায় বাস করতে শুরু করলেন। তিনি শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে নিজ লক্ষ্য প্রচারে ব্রতী হলেন। এই শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বনের ফল হল বিস্ময়কর : কোনো যুদ্ধ ছাড়াই তিনি মানুষের হৃদয় জয় করতে পারলেন। একথা তো বহুবার প্রমাণিত হয়েছে যে, যখন হৃদয় জয় করা হয়ে যায়, বাকি সবকিছু অনায়াসে তার সঙ্গেই আসে।

জীবনে সাফল্যের গোপন রহস্য এই নয়, যে তোমার দ্বারা অন্যদের ক্ষতি হবে। জীবনে সাফল্যের পিছনে মূল মন্ত্র এই, যে তুমি বিচক্ষণতার সঙ্গে তোমার সময় এবং শক্তি সম্পর্কে পরিকল্পনা করবে এবং তোমার আয়ত্তের মধ্যে যে সমস্ত সুযোগ সম্ভাবনা আছে, তার সদ্ব্যবহার করবে। এই সমস্ত কিছুই নীরবে করা উচিত। পয়গম্বর মহম্মদের এই শান্তিপূর্ণ কৌশলের ফলাফল ছিল এই যে, মক্কাত্যাগের সাত বছর পরে তিনি মক্কা - অভিমুখে একটি শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা সংগঠিত করেন, সেদিন আর তাঁর বিরোধীরা কেউ তাঁর মক্কাপ্রবেশে বাধা দিতে পারেনি। কোরানের ১১০ নম্বর সুরায় এই ঘটনাটির উল্লেখ আছে।

বিরোধকালে মানুষ সাধারণত একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করে থাকে। কিন্তু এটি বিচক্ষণ কর্মপদ্ধতি নয়। বিচক্ষণ পদ্ধতি এই যে প্রত্যক্ষ সংঘাত এড়িয়ে নীরব পরিকল্পনার

দ্বারা নিজ লক্ষ্যে পৌঁছানো। এই পুরো সময়টাতে নিজের সম্পর্কে সোচ্চার না হওয়াই উচিত। সমস্ত সম্ভাবনাগুলি আবিষ্কার করে শান্তিপূর্ণভাবে সেগুলি ব্যবহারের চেষ্টা করা উচিত। এটিই প্রকৃতির নিয়ম এবং প্রকৃতির নিয়ম কখনও ব্যর্থ হয় না। প্রকৃতির নিয়মের উপর ভিত্তি করে তুমি যদি এই কৌশল অবলম্বন কর, তুমি নিশ্চয়ই সফল হবে।

বিচ্ছিন্ন করার নীতি

ব্রিটিশ পন্ডিত ই.ই. কেলেট (১৮৬৮-১৯৫০), তাঁর বই, 'আ শর্ট হিস্ট্রি অব রিলিজিয়নস'-এ হজরত মহম্মদ সম্পর্কে বলেছেন:

"পরাজয়কে সাফল্যে পরিণত করার দৃঢ় পণ নিয়ে তিনি সমস্ত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন।" [১]

কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে হজরত মহম্মদ এই অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছিলেন? দুটি বিষয়কে বিচ্ছিন্ন করার নীতির প্রতি তিনি নিষ্ঠাবান ছিলেন। আমরা এর একটি উদাহরণ পাই ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে যখন হজরত মহম্মদ আরব দেশের একটি শহর, মক্কায় তাঁর একেশ্বরবাদ আদর্শের প্রচার শুরু করেন। একেশ্বরবাদ অর্থাৎ একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং কেবল তাঁরই উপাসনা করা। এটি ছিল সপ্তম শতকের প্রথম চতুর্থাংশের ঘটনা এবং সেই সময় আরবরা সাধারণভাবে পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

এর চার হাজার বৎসর পূর্বে, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম ঈশ্বরের উপাসনার জন্য হজরত ইব্রাহিম মক্কা শহরে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এই মসজিদটির নাম কা'বা। কিন্তু পরবর্তী যুগগুলিতে, বিভিন্ন আরব উপজাতির পৌত্তলিকরা কা'বায় তাদের মূর্তিগুলি রাখতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত কা'বা চত্বরে উপাস্য মূর্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬০।

তাঁর উদ্দেশ্যের দিক থেকে দেখলে, এটিই ছিল হজরত মহম্মদের সব থেকে বড় সমস্যা। আপাতভাবে তাঁর উদ্দেশ্য সফল করে তোলার জন্য তাঁর উচিত ছিল কা'বাকে ঐ মূর্তিগুলি থেকে মুক্ত করা, যদিও তাতে কা'বার রক্ষকদের সঙ্গে তাঁর একটি হিংস্র সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু হজরত মহম্মদ নির্মোহভাবে অবস্থার পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে কা'বায় ঐ মূর্তিগুলির উপস্থিতি - যদিও দৃশ্যত একটি নেতিবাচক উপাদান, তার একটি সদর্থক অবদানও আছে। এই মূর্তিগুলি আরব দেশের বিভিন্ন উপজাতির উপাস্য ছিল, এই মূর্তিগুলির দর্শনহেতু আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সারা বছর মক্কায়

বহু মানুষের সমাগম ঘটত। অতএব প্রায় নিয়মিত ভিত্তিতে, কা'বা এবং তার চারপাশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় মানুষের ভিড় হত। হজরত মহম্মদ দুটি বিষয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেখার নীতি গ্রহণ করেছিলেন: কা'বায় মূর্তিগুলির উপস্থিতি এবং সেখানকার জনসমাগম। কা'বায় মূর্তিগুলির উপস্থিতি তিনি সাময়িকভাবে উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন, সেখানে দর্শনার্থীদের যে ভিড় হয়, তিনি তাঁর প্রজন্মের শ্রোতারূপে তাদের উপস্থিতির সদ্ব্যবহার করতে চাইলেন।

হজরত তেরো বছর এই বিচ্ছিন্ন করার নীতি অবলম্বন করেছিলেন, ততদিনে যথেষ্ট সংখ্যক মক্কাবাসী তাঁর অনুগামী হয়ে উঠেছে। এই বিচক্ষণ কৌশলটি ই. ই. কেলেট এই ভাষায় বর্ণনা করেছেন যে: পরাজয়কে সাফল্যে পরিণত করার দৃঢ় পণ নিয়ে তিনি সমস্ত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, হজরত মহম্মদ তাঁর প্রজন্মের জন্য এই ফর্মুলা গ্রহণ করেছিলেন: সমস্যাগুলি উপেক্ষা করো, সম্ভাবনাগুলিকে ব্যবহার করো।

হজরত মহম্মদ প্রাচীন মক্কায় যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন আসলে তা কোনো ধর্মীয় নীতি নয়। তাঁর নীতিটি প্রকৃতির নিয়মের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম অনুসারে, প্রকল্পটি ধর্মীয় অথবা ধর্মনিরপেক্ষ, এই নীতি সকলের জন্য প্রযোজ্য।

সত্য এই যে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, প্রত্যেক অবস্থায় একই সঙ্গে দুটি জিনিসের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায় - সমস্যা এবং সম্ভাবনা। এই অবস্থা কখনই সম্ভব নয় যে একটি মাত্রা আছে, অপরটি নেই; অর্থাৎ কেবল সমস্যা আছে, সম্ভাবনা নেই। সেইজন্য বুদ্ধিমত্তা দাবি করে যে কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকল্প শুরু করার আগে, নির্মোহভাবে অবস্থার পর্যালোচনা করবেন; তিনি কেবলমাত্র সমস্যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কর্মগতি নির্ধারণ থেকে বিরত থাকবেন, কারণ অগ্রগামিতার এই পদ্ধতি প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যেখানে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করে লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব, সেখানে এই বিছিন্ন করার নীতি মানুষকে সহিংস পদ্ধতি অবলম্বন করা থেকে রক্ষা করে।

এই পৃথিবীতে একমাত্র ব্যবহারিক পদ্ধতি হচ্ছে যা ইতিবাচক পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে; অর্থাৎ, সমস্যাকে উপেক্ষা করে উপস্থিত সম্ভাবনাগুলি আবিষ্কার করা এবং সেগুলি ব্যবহার করা। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে এটিই বাস্তববাদী পরিকল্পনা। এবং ফলানুসারে বিচার করলে এই জগতে একমাত্র বাস্তববাদী পরিকল্পনাই সফল হতে পারে।

বর্তমান সময়ে যারা হিংসায় লিপ্ত, তাদের দেখে বোঝা যায় যে তারা বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখার নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সাফল্যের ধারণা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যেহেতু তারা প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যায়, তারা এ জগতে কখনই সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। কেবলমাত্র ধ্বংসের ইতিহাস তৈরি করাই এদের নিয়তি। এরা কখনই প্রগতি ও উন্নতির ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে না। এই পৃথিবীর জন্য স্রষ্টার শাশ্বত আইন অনুসারে হিংসা সম্পূর্ণ অকার্যকর, শান্তিই একমাত্র পথ।

এই পৃথিবীতে ফলাফল কেন্দ্রিক কর্ম তাই, যা শান্তির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যেমন, কোনো কৃষক যদি তাঁর জমিতে বোমা ফেলে আশা করেন যে সেখানে সবুজ ফসল ফলবে তিনি যেমন নিরাশ হবেন, তেমনই হিংসা-আশ্রিত পদ্ধতি সর্বদাই ব্যর্থ হবে।

হিংসার ক্ষমতা অপেক্ষা শান্তির ক্ষমতা বেশি

সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫) ভারতবর্ষের একজন মহান নেতা ছিলেন। ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করা তাঁর লক্ষ্য ছিল। তিনি ভারতীয়দের সামনে এই ঘোষণা করেছিলেন: তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।'

আজাদ হিন্দ ফৌজ (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি)-র নামে ভারতীয়রা তাঁকে রক্ত দিয়েছিল। কিন্তু এই কৌশল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এই লক্ষ্য পূরণের আগেই সুভাষচন্দ্র বসু একটি দুর্ঘটনায় মারা যান।

মহাত্মা গান্ধি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের যথার্থ নেতা রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছিলেন - তা শান্তির। মানুষের জন্য তাঁর ঘোষণা ছিল: 'তোমরা আমার অহিংস কর্মকান্ডে সাহায্য কর, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।'

গান্ধির শান্তিপূর্ণ কৌশল সফল হয়েছিল এবং ১৫ই অগাস্ট, ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করে।

সহিংস পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে সুভাষচন্দ্র বসুর কৌশল গড়ে উঠেছিল। হিংসার এই কৌশল স্বভাবতই ব্রিটিশ শাসক (যারা অনেক শক্তিশালী অবস্থায় ছিল) -দের পক্ষ থেকে প্রতিহিংসার সূচনা করে। সেই কারণে সুভাষচন্দ্র বসুর কৌশল কাজ করতে ব্যর্থ হল এবং ব্রিটিশ শাসন অক্ষুণ্ণ রইল।

মহাত্মা গান্ধির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি যখন ঘোষণা করলেন যে হিংসার শক্তি দিয়ে নয়, সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন, ব্রিটিশ শাসকরা তাদের সহিংসতার সমস্ত যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলল। বলা হয় যে গান্ধির ঘোষণার পরে একজন ব্রিটিশ কালেক্টর তাঁর সংশ্লিষ্ট সচিবালয়ে টেলিগ্রাম মারফত এই বার্তা পাঠিয়েছিলেন যে: 'কিভাবে অহিংস উপায়ে বাঘ মারা যায়, তা দয়া করে জানাও।'

ভারতীয় রাজনীতির এই অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে হিংসার ক্ষমতা অপেক্ষা শান্তির ক্ষমতা অনেক বেশি।

হজরত মহম্মদের জীবনেও একটি সমান্তরাল ঐতিহাসিক উদাহরণ আছে, তিনি যখন ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে আরবে তাঁর কর্মকান্ড শুরু করেন, তখন আরব সংস্কৃতি ছিল উপজাতি-অধ্যুষিত। সে যুগের অবস্থা অনুসারে প্রথমদিকে হজরত ও তাঁর বিরোধীদের মধ্যে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়, এবং অবস্থা অমীমাংসিত থাকে।

কিন্তু হজরত মহম্মদ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি করতে সক্ষম হয়েছিলেন; এটিই ইতিহাসে হুদায়বিইয়া চুক্তি (৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ) নামে প্রসিদ্ধ। এটি ছিল দুই বিবদমান দলের মধ্যে যুদ্ধ না করার বিষয়ে চুক্তি। এই চুক্তির ফলে হজরত শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে নিজের লক্ষ্য পূরণের সুযোগ পেয়েছিলেন। এর ফল হয়েছিল বিস্ময়কর: মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সমগ্র আরব তাঁর আদর্শ গ্রহণ করে।

মার্কিন লেখক মাইকেল এইচ. হার্টের মতে হজরত মহম্মদ ইতিহাসের চুড়ান্ততম সফল ব্যক্তি।[১] তাঁর এই চূড়ান্ত সাফল্যের রহস্য কী? সেটি অবশ্যই "শান্তি"। বিচক্ষণ পরিকল্পনার দ্বারা হজরত আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; তিনি এবং তাঁর অনুচররা এর ফলে সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন সুযোগ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।

একটি হাদিসে হজরতের এই সাধারণ নীতির উল্লেখ আছে: 'যখনই দুটি বিষয়ের মধ্যে হজরতকে নির্বাচন করতে হত, তিনি সর্বদাই কঠিনতর পথ অপেক্ষা সহজতর কর্মপদ্ধতি নির্বাচন করতেন।[২]

এখানে সহজতর কর্মপদ্ধতির অর্থ শান্তির পথ অবলম্বন আর কঠিনতর পথের অর্থ সহিংসতা। এই নীতি অবলম্বন করে হজরত মহম্মদ চূড়ান্ত সফল হয়েছিলেন।

শান্তিপূর্ণ পরিকল্পনার সুযোগ সমস্ত অবস্থাতে সব সময় থাকে। এর জন্য একমাত্র প্রয়োজন, ধৈর্য। কেবলমাত্র ধৈর্যের দ্বারাই নির্মোহ মনে একজন মানুষ অবস্থা পর্যালোচনা করার ক্ষমতা পেতে পারেন। সব রকম পক্ষপাত বা বিরূপতা থেকে মুক্ত হতে পারলে মানুষ দুর্ধর্ষ পরিকল্পনাকারী হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিকেরা বিশ্ব ইতিহাসের পরিসরে হজরত মহম্মদকে একজন প্রচন্ড সফল মানুষ হিসাবে সাধারণভাবে স্বীকার করেন। শান্তিপূর্ণ ধারায় পরিকল্পনা বিষয়ে সুস্পষ্ট চিন্তন তাঁর এই বিপুল সাফল্যের কারণ হয়ে উঠেছিল।

শান্তি কেন সহিংসতার থেকে বেশি ক্ষমতাশালী? এর কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সহিংস পদ্ধতি অবলম্বন করে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য তার প্রতিপক্ষদের ক্ষয়ক্ষতি ঘটানো;

অপরদিকে যে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করে, তার লক্ষ্য নিজেকে শক্তিশালী করে তোলা। **সহিংস পদ্ধতির লক্ষ্য নেতিবাচক, শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির লক্ষ্য ইতিবাচক।**

একথা জীবনের স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে একজনের জন্য অপরের যতই ক্ষতি হ'ক না কেন, তাতে প্রথমজনের শক্তিবৃদ্ধি হতে পারে না। সাফল্যের রহস্য এই যে প্রত্যেককে নিজেকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে এবং নিজের জন্য কোনো নেতিবাচক লক্ষ্য নির্দিষ্ট না করলেই সেটা সম্ভব। একটি ইতিবাচক পরিণতিতে পৌঁছানোর উদ্দেশ্য নিয়েই নিজের নীতি নির্ধারণ করা উচিত।

দুজন পয়গম্বরের প্রতিষ্ঠা করা উদাহরণ

যোশেফ ছিলেন একজন ইজরায়েলি পয়গম্বর এবং মহম্মদ ছিলেন ইসমায়েলি পয়গম্বর। সেমাইটিক ধর্মগুলির কাছে উভয়েই গ্রহণীয় এবং দুজনেই চূড়ান্ত কীর্তিমান।

আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব সপ্তদশ শতক নাগাদ মিশরে পয়গম্বর যোশেফের আবির্ভাব ঘটে। সেই সময় হিকসোস বংশীয় রাজারা মিশর শাসন করছিলেন। একটা সময় মিশরে দুর্ভিক্ষের খুব প্রকোপ দেখা দিল। যোশেফের পরিকল্পনা অনুসারে মিশর সে যাত্রা খাদ্যাভাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল। মিশরের রাজা তখন যোশেফকে ডেকে তাঁর প্রশাসনে একটি উঁচু পদ, অর্থাৎ রাজ্যের সমস্ত শস্যাগারের প্রশাসক *(খাজাইন আল-আর্জ)* (১২:৫৫) করে দিতে চাইলেন।

বাইবেল অনুসারে, রাজা যোশেফকে বলেছিলেন:

'তুমি অবস্থান করবে আমার গৃহের উপরে এবং আমার সমস্ত লোকেরা তোমার আদেশ মান্য করবে। কেবলমাত্র সিংহাসন বিষয়ে আমি তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ থাকব।[১]

যোশেফ রাজার এই প্রস্তাবিত পদ গ্রহণ করেন এবং সম্ভবত আমৃত্যু সেই পদে আসীন ছিলেন। *আহসান আল-কাসাস* বা সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনী রূপে কোরানে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। যোশেফের কাহিনি কিভাবে শ্রেষ্ঠতম কাহিনী হয়ে উঠল? বিচক্ষণতার প্রয়োগের দ্বারা এটি সম্ভব হয়েছিল। দেশের সার্বভৌমত্বের রক্ষাকারী ছিলেন রাজা: পয়গম্বর যোশেফ রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার ফর্মুলা গ্রহণ করেন।

উপরি উক্ত কোরানের আয়াতে 'শ্রেষ্ঠতম কাহিনী'র মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতির উল্লেখ আছে। পয়গম্বর যোশেফ যে পথ অবলম্বন করেছিলেন তা ছিল এই, যে তিনি রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করার চেষ্টা করেন নি, সেই সময়ের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এর ফল হয়েছিল আশ্চর্যজনক। সিংহাসনে না থেকেও যোশেফ প্রাচীন মিশরের সমস্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিলেন।

যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল তার কারণেই এই কাহিনী 'শ্রেষ্ঠতম' হয়ে উঠেছে। ঈশ্বর তাঁর দূতের দ্বারা এই উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যাতে পরবর্তী প্রজন্মগুলি তা অনুসরণ করে অনুরূপভাবে সফল হয়ে উঠতে পারে।

অন্য কাহিনীটি হজরত মহম্মদের। তিনি সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে আরবদেশে তাঁর ধর্মপ্রচার শুরু করেন। আরব সেই সময় বহু ঈশ্বরবাদী অঞ্চল ছিল এবং মক্কা ছিল মূর্তি উপাসনা সংস্কৃতির কেন্দ্র।

হজরত মহম্মদ যখন তাঁর তৌহিদ বা একেশ্বরবাদের প্রচার শুরু করেন, সমস্ত উপজাতীয় নেতারা তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন। তারা তাঁর এবং তাঁর অনুচরদের জন্য সমস্ত রকম সমস্যা সৃষ্টি করেন। তারপর ৬২৮ খৃষ্টাব্দে মক্কা থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে হুদায়বিইয়া নামক স্থানে হজরত মহম্মদ আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আলাপ আলোচনা শুরু করেন। কোনো রকম শান্তি চুক্তি বিষয়ে এই উপজাতীয় নেতাদের প্রবল আপত্তি ছিল। খুবই বিচক্ষণতার সঙ্গে হজরত মহম্মদ প্রতিপক্ষের সমস্ত শর্ত মেনে নেন এবং তারা হুদায়বিইয়ার চুক্তি চূড়ান্ত করে; এটি ছিল দশ বছরের জন্য কোনোরূপ যুদ্ধ না হওয়ার চুক্তি।

এই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে আরবে স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপরে হজরত মহম্মদ আর কোনো সময় নষ্ট করেন নি এবং বিচক্ষণ পরিকল্পনার সঙ্গে আরব ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে তাঁর ধর্মপ্রচার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। এর ফলাফল ছিল বিস্ময়কর। কয়েক বছরের মধ্যে গোটা আরব দেশ তাঁর আদর্শ গ্রহণ করে। হুদায়বিইয়ার চুক্তি ছিল শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির প্রকাশ এবং এই পদ্ধতি গ্রহণ করে হজরত মহম্মদ সেই সময়ের আরবে অবস্থার নিয়ন্ত্রকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

রাজার সাংবিধানিক কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে পয়গম্বর জোশেফ সাফল্য অর্জন করেছিলেন; এর বিনিময়ে রাজা তাঁকে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্ত বিষয় পরিচালনার সুযোগ দিয়েছিলেন।

হজরত মহম্মদ ও অন্যভাবে একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। তিনি উপজাতীয় নেতাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং বিচক্ষণ পরিকল্পনার মাধ্যমে অরাজনৈতিক ক্ষেত্রের সম্ভাবনাগুলিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। আবার ফল হয়েছিল বিস্ময়কর: হজরত মহম্মদ আরব দেশের নেতা রূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

কোরানে পয়গম্বর জোশেফের পদ্ধতিকে ‘শ্রেষ্ঠতম কাহিনী’ (১২:৩) রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত মহম্মদের পরিকল্পনার ফলাফলকে ‘স্পষ্ট বিজয়’ (৪৮:১) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। **দুটি পদ্ধতিরই সারমর্ম ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো বিরোধের সূচনা না করে অরাজনৈতিক ক্ষেত্রের সম্ভাবনাগুলি ব্যবহার করা। তাহলেই জয় অনিবার্য।**

জোসেফ এবং মহম্মদ, এই দুই পয়গম্বরের অনুসৃত পদ্ধতি কেবলমাত্র অতীতেই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল এমন নয়; এগুলি সর্বদাই প্রযোজ্য, এমনকি আজও। যারা বর্তমান সময়ে সহিংস কর্মধারায় নিয়োজিত, এই পদ্ধতি তাদের জন্যও কার্যকরী। এই নীতি একটি বিশ্বজনীন নীতি - অনুরূপ অবস্থায় অন্য কোনো নীতি কার্যকর হবে না।

একটি প্রতিষ্ঠান সিদ্ধ সংঘর্ষনিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা (বাফার)

হজরত মহম্মদ যে সময় মক্কায় অবস্থান করছিলেন (৬১০-৬৩২ খৃষ্টাব্দ), সেই সময়, ৬২৭ খৃষ্টাব্দে, ব্যাটল অব দ্য ট্রেঞ্চ, পরিখার যুদ্ধ বা *গাজওয়া আল-খান্দাক* নামে একটি যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হজরত মহম্মদের বিরোধীরা মদিনা আক্রমণ করতে বের হয়। কিন্তু হজরতের বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনার কারণে শেষ পর্যন্ত কোনো সামরিক সংঘাত ঘটে নি।

হজরত মহম্মদের গুপ্তচর ব্যবস্থা খুবই সংগঠিত ছিল, তিনি খবর পেয়েছিলেন যে হাজার সৈন্যের একটি দল মক্কা থেকে আনুমানিক ৪৫০ কিলোমিটার দূরত্বে মদিনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। শহরটি আক্রমণ করা এদের উদ্দেশ্য ছিল।

তাঁর সাধারণ নীতি অনুসারে, হজরত বিবেচনা করেছিলেন যে যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়া হবে সবথেকে বুদ্ধিমানের কাজ। তদনুযায়ী তাঁর অনুচরদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে মদিনা শহরের বাইরে একটি পরিখা কাটা হবে। এটি খুবই বাস্তববাদী পরিকল্পনা ছিল, কারণ মদিনা শহরে মাত্র একদিক থেকে আক্রমণ ঘটতে পারত-শহরের বাকি তিনদিক দুর্গম পাহাড় ও খেজুরগাছের ঘন বনে ঘেরা ছিল; সেই পথে আক্রমণ অসম্ভব ছিল। এই পরিখাটি খননের জন্য হজরত মহম্মদ ও তাঁর অনুচরেরা দশদিন দিবারাত্রি পরিশ্রম করেছিলেন। এই পরিখাটি আয়তনে ছিল প্রায় ৫৫৪৪ মিটার লম্বা, ৪.৬ মিটার চওড়া ও ৩.২ মিটার গভীর।

হজরত মহম্মদের বিরোধীরা যখন মদিনা শহরে প্রায় পৌঁছে গিয়েছে, তখন শহরের প্রবেশ প্রান্তে তারা আবিষ্কার করল যে এই পরিখাটি তাদের শহরে ঢোকার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। তারা মদিনা শহরের বাইরে তাঁবু খাটিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল এবং দুই সপ্তাহের অবিবেচনা ও হতাশার শেষে তারা পিছু হঠতে বাধ্য হল। এটিকেই 'বাফার স্ট্র্যাটেজি' বা সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রক কৌশলের উদাহরণ মনে করা যেতে পারে। পরিখাটি দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ নিবারণের কাজ করেছিল এবং সামরিক সম্ভাবনা বা যুদ্ধ আটকে দিয়েছিল।

আজ আমরা এমন একটা যুগে বাস করছি যখন আরো অনেক বড় মাত্রায় এই সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রক কৌশল আমাদের সামনে উপস্থিত। আজকের রাষ্ট্র সংঘে কার্যত আমরা সেই 'বাফার' বা সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাপনা পাই যা বিবদমান দুটি বৈরীভাবাপন্ন দেশের মধ্যে একই কাজ করতে পারে। ১৯৪৫ সালে গঠিত রাষ্ট্র সংঘ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের জন্যই তার সদস্যপদ খুলে রেখেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদের সপ্তম অধ্যায়ে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, কোনো দেশ যদি অপর কোনো দেশকে আক্রমণ করে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ সক্রিয়ভাবে সেই বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করবে।

এই রকম একটি সফল হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটেছিল, যখন ইরাক ১৯৯০ সালে কুয়েত আক্রমণ করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সফল হস্তক্ষেপের কারণে কুয়েত ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। অতএব পৃথিবীর সমস্ত দেশের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ একটি বড় আশীর্বাদ স্বরূপ, কারণ তা একটি প্রতিষ্ঠানিক সংঘর্ষানিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার কাজ করে।

যুদ্ধ এড়ানোর জন্য সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রক কৌশল খুবই কার্যকরী একটি উপায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে এই বাফার কৌশল খুবই সীমিত মাত্রায় প্রয়োগ করা সম্ভব হত, যুদ্ধ নিবারণের জন্য একুশ শতকে এটি খুবই সংগঠিত উপায়। এখন একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে, পৃথিবীর সমস্ত দেশই রাষ্ট্রসঙ্ঘের আওতায় পড়ে।

সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য আধুনিক স ভ্যতা একটি নতুন কর্মপদ্ধতি গড়ে তুলেছে, তা হল শান্তিপূর্ণ বাক্যালাপ। শান্তিপূর্ণ কথাবার্তার মাধ্যমে, আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে একটি সহিংস সংঘাতের সম্ভাবনাকে বৌদ্ধিক আলোচনায় পর্যবসিত করা সম্ভব। এটি সাম্প্রতিক কালে গড়ে ওঠা অন্যতম প্রাতিষ্ঠানিক সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা।

সংঘর্ষের সম্ভাবনার সম্মুখীন হওয়ামাত্র যদি কেউ এই বাফার কৌশল ব্যবহার করে, তাহলে আনুমানিক অন্যান্য সমস্যাগুলিও মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। বাফার কৌশল বা সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাপনা শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম চাবিকাঠি। কিন্তু এই ফর্মুলাটির যথাযথ ব্যবহার করতে চাইলে ধৈর্য ও বিচক্ষণ পরিকল্পনার প্রয়োজন।

সহিংসতায় লিপ্ত হওয়ার জন্য কোনো বিচক্ষণতার প্রয়োজন হয় না। যে কোনো মূর্খ তা করতে পারে। কিন্তু শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও শান্তিরক্ষার জন্য একটি উচ্চস্তরের বুদ্ধিমত্তা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। যে ব্যক্তি বিচক্ষণ পরিকল্পনার দ্বারা সমস্যা মোকাবিলা করতে জানে সে হিংসার পথ গ্রহণ করা থেকে সর্বদাই বিরত থাকবে।

বুদ্ধিমত্তা এই নির্দেশ করে যে কোনো সম্ভাব্য বিস্ফোরক অবস্থায়, বিরুদ্ধ পক্ষগুলিকে সংঘাতের পথে যাওয়া থেকে আটকাতে কৌশল হিসেবে কোনো সংঘর্ষ

নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা ব্যবহার করতে হবে। আগেকার সময়ে এই কৌশল খুব সীমিত মাত্রায় ব্যবহার করা যেত। কিন্তু এই কৌশলের একটি বিশ্বব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঘটেছে, এর ব্যবহারের সুযোগ ভীষণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ।

যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির ফলে আলোচনা ও চিন্তন বিনিময়ের সুযোগ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিন্তনের উদারীকরণ এবং আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের ফলে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীগুলির পক্ষে এই কৌশল অবলম্বন করা সম্ভব হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ইতিহাসের অভিজ্ঞতা

আদর্শবাদ ও বাস্তবধর্মিতার মধ্যে বাঁচা

প্রতিটি যুগেই দার্শনিক ও সংস্কারকরা আদর্শবাদের ধারণাটি দ্বারা আবিষ্ট থাকেন। কেউ কেউ আদর্শ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন; তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। কেউ কেউ আদর্শ সমাজ গড়তে চেয়েছেন, তাঁরাও ব্যর্থ হয়েছেন। কেউ কেউ সমাজে আদর্শ ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, সমস্ত আত্মত্যাগ সত্ত্বেও তাঁরাও বিফল হয়েছিলেন।

এই সাধারণ বিফলতার কারণ কী? একথা যথার্থই বলা হয়ে থাকে যে আদর্শকে অর্জন করা যায় না। এর কারণ এই যে, মানুষের জন্ম হয়েছে যে মন নিয়ে, তা আদর্শ সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে, কিন্তু আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, সেটি আদর্শ নয়। মানুষ আদর্শকে অর্জন করার জন্য উদ্বেলিত হয় কিন্তু তাকে বাধ্যত এমন একটি পৃথিবীতে বাস করতে হয় যা আদর্শ থেকে অনেক দূরে। যেমন, এক সুপরিচিত বিজ্ঞানী একবার যথার্থ মন্তব্য করেছিলেন যে মনে হয় যেন মানুষ ভুলক্রমে এমন এক পৃথিবীতে চলে এসেছে যা তার জন্য তৈরী হয় নি।[১]

মানবসমাজের সমস্ত অস্থিরতাকে এই তথ্য থেকে বোঝা যেতে পারে। সমস্ত নারী পুরুষ তাদের ভাবনা অনুসারে বাঁচতে চায়, এই ভাবনা আদর্শবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম যেমন, তারা নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। আমাদের আদর্শ সম্পর্কিত ধারণা এবং বাস্তবের পার্থক্যের কারণেই সমস্যা সৃষ্টি হয়। তার ফলে মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে, তারা অভিযোগ ও প্রতিবাদ সূচিত করে, এবং শেষ পর্যন্ত সহিংস হয়ে ওঠে। প্রায়শই তারা নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংঘর্ষের আশ্রয় নেয়, সে লক্ষ্য এমন যা পৃথিবীতে অধরাই রয়ে যায়।

এই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় বাস্তবধর্মিতার ফর্মুলা গ্রহণ করা। যখন আদর্শ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়, তখন বাস্তববাদী লক্ষ্য অর্জন করে তৃপ্ত থাকাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচক্ষণতার নিদর্শন।

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এই বিষয়টির উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রীসের রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু এটি তাঁর জন্য আদর্শের অনেক কম ছিল, কারণ তিনি সমগ্র বিশ্ব জয় করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি এই লক্ষ্য অর্জনে

বের হয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাস আমাদের বলে যে তিনি পরাজয়ের এক গভীর বোধ নিয়ে ৩২৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলন শহরে মারা যান; তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩২।

আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেটের জন্য গ্রীসের শাসনক্ষমতা ছিল একটি বাস্তববাদী পছন্দ, কিন্তু রাজনৈতিক খেয়ালবশে, তিনি সমস্ত পৃথিবী জয় করতে চেয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাভাবনা অনুসারে তিনি একটি লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে সেই আদর্শ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব ছিল না। যদি আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেট বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতেন, তিনি নিশ্চয় সফল হতেন। কিন্তু একটি লক্ষ্যের সন্ধান করতে গিয়ে, তিনি যা অর্জন করেছিলেন তা তো হারালেনই; উপরন্তু তিনি যে লক্ষ্য স্থির করেছিলেন তাও অর্জন করা সম্ভব হল না।

এই পৃথিবীতে প্রায় সমস্ত মানুষেরই এই অবস্থা। একটি জাপানি প্রবাদ অনুসারে, ‘ যদি তুমি দুটো খরগোশ ধরবার চেষ্টা করো, তাহলে দুটোই হারাবে।’ এর সামান্য পরিবর্তন করে বলা যায় যে, যে ব্যক্তি আদর্শ লক্ষ্যের পিছনে ছোটে, সে আদর্শ এবং বাস্তবভিত্তিক অর্জনীয় লক্ষ্য, দুটিই হারায়।

এই মোহের কারণে বহু মানুষ মানসিক চাপ ভোগ করে। সেই চাপ এমন একটি বিন্দুতে পৌঁছায় যে মানুষ ক্রমাগত অভিযোগ ও প্রতিবাদ করতে শুরু করে। এই ঘটনা থেকেই প্রায়শ সহিংসতার সূচনা হয়। মানুষের এই মনস্তত্ত্ব হিংসার ভিত্তি। যদি মানুষ এই বিষয়ে প্রকৃতির নিয়ম জানত তাহলে তারা নিজেরা শান্তিতে বসবাস করতে পারত এবং অন্যদের শান্তিপূর্ণ বসবাসের সুযোগ উপহার দিতে পারত।

যেমন, সোভিয়েত রাশিয়ার স্বপ্ন ছিল একটি কমিউনিস্ট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, যে কারণেই শেষ পর্যন্ত সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে। কমিউনিস্ট রাশিয়ার জন্য এই লক্ষ্য ছিল অবাস্তব। যদি সে একটি ব্যবহারিক লক্ষ্য স্থির করত তাহলে ইতিহাসে কমিউনিজমের এমন একটি দর্শন হিসাবে স্থান হত না যা শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অত্যন্ত সহিংস পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল।

এই একই বিষয় সেই মানুষদের জন্যও প্রযোজ্য যাঁরা হিংসাকে একটি পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মনে একটি আত্ম-নির্ধারিত লক্ষ্য আছে - যেমন নিপীড়নের অবসান বা আদর্শ ন্যায় প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন আত্মত্যাগ করা সত্ত্বেও তাঁরা কিছু অর্জন করতে পারেন নি। তাঁরা শুধুমাত্র ধ্বংসের ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁরা যদি সহিংস উপায় ত্যাগ করে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, ইতিহাস নিশ্চয় তাঁদের এই কারণে মনে রাখত যে তাঁরা নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য শান্তিপূর্ণ পথ বেছে নিয়েছিলেন।

বাস্তবতার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ পরিকল্পনা

সৃষ্টি পরিকল্পনার একটি দৃষ্টিকোণ কোরানে এই ভাবে বর্ণিত হয়েছে: 'আমরা নিশ্চয় ভীতি এবং ক্ষুধার দ্বারা তোমায় পরীক্ষা করব, এবং সম্পত্তি, জীবন ও শস্যের হানি দ্বারা। যারা সাহসের সঙ্গে সব সহ্য করছে তাদের সুসংবাদ দাও' (২:১৫৫)। এর অর্থ এই যে, ঈশ্বরের সৃষ্টি পরিকল্পনা অনুসারে, রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক, উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতি জীবনের অংশ বলেই বিবেচিত। অতএব, এর প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী এই যে ক্ষতিকে একটি বাস্তব মেনেই গ্রহণ করতে হবে এবং ভবিষ্যতের সংঘর্ষহীন ক্ষেত্রগুলির জন্য শান্তিপূর্ণভাবে পরিকল্পনা করতে হবে। এর বিপরীত দিকে, যা হারিয়ে গিয়েছে তা পুনরুদ্ধারের জন্য যারা পরিকল্পনা করে, তারা বিফল হতে বাধ্য।

যেমন, পূর্বে পাকিস্তান ভারতীয় উপমহাদেশের অংশ ছিল। এই দেশ ১৯৪৭ সালে দেশাভাগের পরে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ (১৮৭৬-১৯৪৮)-র নেতৃত্বে গঠিত হয়। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ (১৮৭৬-১৯৪৮) ছিলেন ঐ দেশের প্রতিষ্ঠাতা নেতা। কিন্তু জিন্নাহ্ যে পাকিস্তান পেয়েছিলেন, তা তাঁর স্বপ্নের হিসাব মত ছিল না। তাঁর একটি বক্তৃতায় তিনি এই ভৌগোলিকভাবে খন্ডিত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপছন্দের কথা বলেছিলেন।[১]

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতার এই উক্তি সমস্ত পাকিস্তানি জনসাধারণের জন্য একটি ধারা প্রতিষ্ঠা করে ছিল। তারপর থেকে পাকিস্তানের ভৌগোলিক এই খন্ডনের বিরুদ্ধে অভিযোগ সে দেশের জাতীয় নীতি হয়ে গেল।

তাদের মূল প্রস্তাব অনুসারে, কথা ছিল কাশ্মীর পাকিস্তানের অংশ হবে কিন্তু দেশভাগের পরে দেখা গেল কাশ্মীর ভারতের অংশ হয়েছে। পাকিস্তানি নেতাদের কাছে বিষয়টি গ্রহণযোগ্য ছিল না। এর পর কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অংশ করে তোলাকে কেন্দ্র করেই পাকিস্তানের জাতীয় নীতি বিবর্তিত হয়েছে। পাকিস্তানের পূর্বতন রাষ্ট্রপতি, পারভেজ মুশারফ বলেছিলেন:

'কাশ্মীর আমাদের রক্তে বয়ে চলে।'[২]

এই মোহাবিষ্টতার কারণে পাকিস্তান ভারতবর্ষের সঙ্গে অনেকগুলি যুদ্ধ লড়েছে।

সে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে একটি ছায়াযুদ্ধও শুরু করেছে। পাকিস্তানের সেই তথাকথিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি আসলে কাশ্মীরের বিষয়ে জেহাদ ঘোষণা করেছে।

কাশ্মীর পুনরুদ্ধারের জন্য তারা ষাট বছরের বেশি সময় ব্যয় করেছে কিন্তু এই প্রচেষ্টায় তারা সফল হয় নি। এর বিপরীত দিকে, পাকিস্তানের এই কৌশল এতদূর প্রতি - উৎপাদক হয়ে উঠেছে যে বিশ্ববাসীর চোখে পাকিস্তান একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে।

এর বিপরীত উদাহরণ হল সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুর আগে ছিল মালয়েশিয়ার অন্তর্গত, ১৯৬৫ সালে মালয়েশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সিঙ্গাপুরের স্বাধীন প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। ভৌগোলিকভাবে, এই সিঙ্গাপুর ছিল খন্ডিত সিঙ্গাপুর। কিন্তু সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠাতা নেতা লি কুয়ান ইউ (১৯২৩-২০১৫) খুবই বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। তিনি সিঙ্গাপুরের এই ভৌগোলিক খন্ডতাকে বাতিল করার চেষ্টায় সময় নষ্ট করেন নি। বরঞ্চ প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে তাঁর দেশের উন্নয়ন ও প্রগতির পরিকল্পনায় তিনি সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেছিলেন। দেশটির জন্মের চল্লিশ বছরের মধ্যে, সমস্ত দিক থেকে উন্নত দেশ হিসাবে সিঙ্গাপুরের আবির্ভাব ঘটেছিল।

আজ পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ৪,৮৪০ ডলার, সিঙ্গাপুরের ক্ষেত্রে তা ৭৬, ৮৬০ ডলার। সিঙ্গাপুরের কোনো অর্থনৈতিক ঋণ নেই; অপরদিকে, পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক ঋণ এবং দায়বদ্ধতা সাড়ে ছয় কোটি ডলারের সঙ্কটজনক অংক ছুঁয়েছে। ইন্টেলসেন্টার, বিশ্বব্যাপী গোয়েন্দা সংস্থাগুলির জন্য কাজ করে এমন একটি ওয়াশিংটন ভিত্তিক কোম্পানি ৯ই ডিসেম্বর, ২০১৪ সালে কান্ট্রি থ্রেট ইন্ডেক্স (সিটিআই) নামক যে সূচক প্রকাশ করে, সে অনুসারে বিশ্বের বিপজ্জনক দেশগুলির তালিকায় পাকিস্তান আট নম্বরে আছে।

জানুয়ারী ২০১৫ সালে ইকনমিস্ট-এর ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্ত্তৃক প্রকাশিত তথ্যানুসারে সিঙ্গাপুর বিশ্বের দ্বিতীয় নিরাপদ শহর।

এই দুটি দেশের মধ্যে পার্থক্যের একটাই প্রধান কারণ। দেশ সৃষ্টির পরে পাকিস্তান সহিংস কর্মকান্ডের পথ নেয় এবং তার জন্য তাকে খুবই বেশি দাম দিতে হয়। অপরদিকে সিঙ্গাপুর শান্তিপূর্ণ সৃজনশীল কর্মসমূহে মনোনিবেশ করে এবং সে আজ এই শান্তিপূর্ণ নীতির সেরা ফসল তুলছে।

প্যালেস্টাইনের কাহিনিও অনুরূপ। বালফোর ঘোষণাপত্র অনুসারে ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইন ভাগ হয়। আরবরা প্যালেস্টাইনকে একটি খন্ডিত ভূমি হিসাবে দেখেছেন

এবং এই খন্ডন রোধের জন্য প্রচুর শ্রম ব্যয় করেছেন। কিন্তু বহু আত্মত্যাগ করেও তাঁরা সফল হন নি। তার কারণ এই যে তাঁদের সংগ্রাম ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ছিল না, তাঁদের সংগ্রাম হয়ে উঠেছিল প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে। এই পৃথিবীতে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে কেউ কোনো যুদ্ধে জিততে পারে না।

সত্য এই যে পৃথিবীতে কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিকল্পনার ভিত্তিতে সফল হওয়া সম্ভব। এর অর্থ, প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে পরিকল্পনা করা। যে সম্পদের অস্তিত্ব নেই তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা করা কেবলমাত্র সম্ভাব্য শত্রুর বিরুদ্ধে হিংসা বৃদ্ধি করে, এর ফলে ক্ষতিও বৃদ্ধি পায়। অভিজ্ঞতা এই কথা বলে যে প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে পরিকল্পনা একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে।

শান্তিপূর্ণ পরিকল্পনার সুবিধা এই যে, এর কারণে প্রথম দিন থেকেই উন্নয়নের কাজ শুরু হয়, আর অপ্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে পরিকল্পনার অর্থ উন্নয়ন ভবিষ্যতের অনির্ধাবিত বিষয় হয়ে থাকবে।

পরিকল্পনা একটি শান্তিপূর্ণ কর্ম যার দ্বারা সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হয়। যখন তুমি পরিকল্পনায় রত হও, পুরো প্রক্রিয়াটি শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে চলতে থাকে। কিন্তু যখন তুমি সহিংস পদ্ধতিতে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করো, তখন তা সম্ভব হয় না। প্রকৃতির নিয়ম এই যে সঠিক বিন্দু থেকে শুরু করলে তবেই কেউ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।

এই নীতি প্রতিটি ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জাতির জন্য প্রযোজ্য। যে সহিংস কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়, সে কখনই তার শ্রমকে ফলপ্রসূ হতে দেখবে না কারণ সে ঠিকভাবে তার কাজ শুরু করে নি। বিপরীত দিকে, যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করে সে নিশ্চয় তার বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছবে; কারণ একেবারে প্রথম থেকেই তার কাজ সঠিক ধারায় ছিল।

বন্দুক এবং বোমা দিয়ে আতঙ্কবাদীরা মানুষকে হত্যা করতে পারে, কিন্তু তারা প্রকৃতির নিয়ম পাল্টাতে পারে না। প্রকৃতির নিয়মের পরিবর্তন মানুষের অসাধ্য কর্ম।

সহিংস কর্মকাণ্ড
শান্তিপূর্ণ কর্মকাণ্ড

ইংরেজ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন (১৭৩৭-১৭৯৪), *দ্য হিস্ট্রি অব দ্য ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অব দ্য রোমান এম্পায়ার* গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন:

ইতিহাস অবশ্যই মানবতার অপরাধ, ভ্রান্তি ও দুর্ভাগ্যের পঞ্জীকরণের থেকে কিছু বেশি।[১]

এটি একটি নেতিবাচক মন্তব্য। কিন্তু ইতিহাসের প্রত্যেকটি ঘটনা, তা ইতিবাচক হক বা নেতিবাচক, আমাদের জন্য একটি শিক্ষা নিয়ে আসে। এই অর্থে, একথা সঠিক যে ইতিহাস প্রয়োজনীয় শিক্ষায় পূর্ণ। ইউরোপীয় রাজনীতিকরা দুটি প্রধান যুদ্ধ করেছিলেন: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)। এর ফলে সামরিক এবং নাগরিক জনসংখ্যা মিলিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রায় নয় কোটি। ঐ মহাদেশের অর্থনীতি প্রবলভাবে পিছিয়ে পড়ে এবং শিক্ষার মত সৃজনশীল কর্ম ব্যাহত হয়। এই বিশ্বযুদ্ধগুলি থেকে কোনো ইতিবাচক ফলাফলের কথা কোনো ঐতিহাসিক কখনও বলেন নি।

একই সময়ে সেই ইউরোপে আর এক ধরনের কর্মকাণ্ড চলছিল। সেই কর্মকাণ্ডের নেতৃত্বে ছিলেন বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ এবং অন্যান্য চিন্তাশীল মানুষরা। এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীর কর্মকান্ডের ফলাফল যথেষ্ট আলাদা ছিল: এর ফলে গৌরবময় ঐতিহাসিক উন্নতির সূচনা হয়েছিল যা ক্রমে আমাদের আধুনিক সভ্যতার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিল।

প্রথম গোষ্ঠীটির সদস্যরা ছিলেন সহিংস কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত, দ্বিতীয় গোষ্ঠীর সদস্যরা শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। সহিংস কর্মধারা পৃথিবীকে কিছুই দেয় নি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও নয়। অপরদিকে, শান্তিপূর্ণ কর্মধারা সমগ্র মানবতার জন্য সভ্যতার এমন এক পর্ব সূচনা করে যা অদৃষ্টপূর্ব এবং আগের সমস্ত পর্বের থেকে অনেক বেশি উন্নত ছিল।

আমরা যদি প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে দুটি ঘটনাধারাকে মূল্যায়নের চেষ্টা করি, তাহলে আমরা নিরাপদে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, অতীতের অজস্র উদাহরণ প্রমাণ করে যে সহিংস পদ্ধতি গ্রহণ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। যারা এই সহিংস পথে আছে, তাদের সেই পথ ত্যাগ করার এটাই শ্রেষ্ঠ সময়। দুবার বিষ খেয়েছে এমন মানুষের কথা সচরাচর শোনা য়ায় না। অনুরূপ সহিংসতা চালিয়ে যাওয়ার কোনো যুক্তি নেই।

বর্তমান যুগে ধর্মের নামে বোমা-বন্দুকের সংস্কৃতির কোনো যুক্তি নেই। তাদের সহিংস সংস্কৃতির নেতিবাচক ফলগুলি আমরা প্রতিদিন গণমাধ্যমে দেখতে পাই; কোনো ইতিবাচক ফলাফলের কথা কখনও শোনা যায় না।

যারা হিংসার সংস্কৃতিতে যুক্ত তাদের যদি প্রশ্ন করা হয়, কেন তারা সেই পথ অবলম্বন করেছে, তারা বলবে ন্যায়ের খোঁজে তারা হিংসার পথে গিয়েছে। কিন্তু এটাই সত্য যে হিংসার আশ্রয় নেওয়া তার নিজের মত করে সবথেকে বড় রকমের অন্যায়। **আগুন ও রক্তের এই খেলাকে ন্যায় প্রতিষ্ঠার উপায়রূপে বর্ণনা করার যুক্তি গ্রহণ করা যায় না। এই সমস্ত মানুষদের সম্পর্কে সত্য এই যে, ঈশ্বর এবং মানুষ, উভয়ের চোখেই তাদের কাজ ঘৃণ্য অপরাধ বলে বিবেচিত।**

বর্তমান যুগে যারা সহিংস পথ অবলম্বন করে তাদের যথার্থই সন্ত্রাসবাদী বলা হয়। তাদের সহিংস কর্মকাণ্ডে যারা মারা যায়, তারা সকলেই নিরীহ মানুষ। এই পৃথিবীতে এক স্বাস্থ্যকর ভূমিকা পালনের জন্য স্রষ্টা তাদের সৃষ্টি করেছিলেন।

কিন্তু সন্ত্রাসবাদীর কর্মকাণ্ড ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে বিপর্যস্ত করে তোলে; এর ফলে সে মানুষরা ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসম্পাদন থেকে বিরত হয়। সন্ত্রাসবাদীদের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে সব থেকে বড় অপরাধ, এবং যে অপরাধীরা নিরন্তর এই অপকর্ম করে চলেছে, তারা ঈশ্বরের ক্ষমার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। যদি আমরা ইতিহাস পড়ি তাহলে দেখব, মানব ইতিহাস যুদ্ধের উদাহরণে পূর্ণ। সমস্ত ক্ষেত্রেই যুদ্ধের ফলে কেবলমাত্র ব্যাপক প্রাণহানি ও সম্পত্তির বিনাশ ঘটেছে। অতএব বলা যায় যে, প্রথম যে ব্যক্তিরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন তাদের ক্ষমা করা চলে কারণ তাঁরা এর ফলাফল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। কিন্তু যুদ্ধের নেতিবাচক অভিজ্ঞতার কথা জানা সত্ত্বেও যারা এই পথে চলতে থাকে, তাদের অপরাধ অমার্জনীয়।

আধুনিক যুগে, যুদ্ধ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে। এই যুগে সম্ভাবনার বিস্ফোরণ ঘটেছে। আজ সম্ভাবনা এত দূর বৃদ্ধি পেয়েছে যে শান্তিপূর্ণ পথেই সবকিছু অর্জন করা সম্ভব। এ কথা বলা যথার্থ হবে যে বর্তমান অবস্থায়, সহিংসতা এবং যুদ্ধ

কোনো পথ হতে পারে না। অতীতে সংঘর্ষের মাধ্যমে যা অর্জন করা অসম্ভব ছিল বর্তমান কালে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে তা অর্জন করা সম্ভব।

আজকে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করার অর্থ হল একটি গাছকে নির্বিঘ্নে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে দেওয়া; সহিংস পদ্ধতি যেন সেই গাছটিকে কেটে ফেলার সামিল। আমাদের দায়িত্ব হল গাছটির বৃদ্ধিতে সহায়তা করা, তাকে কেটে ফেলা নয় - এই বিতর্কাতীত তত্ত্ব শুধু বাগান করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তা মানব সমাজের জন্যও প্রযোজ্য।

যে ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল

২০০৩ সালের মার্চ মাসে ইরাক আক্রমণের সঙ্গে ইরাক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ জুনিয়রের কার্যকালে আমেরিকার নেতৃত্বে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আমেরিকার দ্বারা বিশ্বায়িত স্তরে এই সামরিক আগ্রাসন পরিকল্পিত হয়েছিল। আমেরিকার নেতারা এই কৌশলের ফলাফল বিষয়ে বিশেষ আশান্বিত ছিলেন। আমার কিন্তু এই যুদ্ধ বিষয়ে প্রবল আশঙ্কা ছিল। এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগেই এই যুদ্ধের সম্ভাব্য ফলাফল বিষয়ে আমি একটি জাতীয় সংবাদপত্রে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিপরীত মন্তব্য করি। 'দ্য টাইম্স্ অব ইন্ডিয়া' পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষ্যাৎকারটি 'ইউ এস অ্যাগ্রেসন উড বি কাউন্টার প্রডাক্টিভ' (মার্কিন আগ্রাসন প্রতি উৎপাদক হয়ে উঠবে) এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়।[১]

কোনো রহস্যজনক জ্ঞানের ভিত্তিতে আমি এই মন্তব্য করিনি, ইতিহাসের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই মন্তব্য। একথা সত্য যে সমগ্র ইতিহাস জুড়ে কখনও এমন ঘটনা ঘটে নি যে, সামরিক কর্মকান্ডের দ্বারা কাঙ্খিত ফললাভ হয়েছে। আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেট (৩৫৬-৩২৪ খৃষ্টপূর্বাব্দ) এবং অ্যাডল্ফ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫)-এর করা যুদ্ধগুলির জন্য একথা সত্য, আজকের যুদ্ধবাজদের জন্যও এই কথা সমানভাবে সত্য।

দেখা গিয়েছে যে, যে কোনো যুদ্ধে যে পক্ষ পরাজিত হল, ক্ষয়ক্ষতি যে কেবলমাত্র তার এমন নয়, বিজয়ীপক্ষের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও পরাজিতের প্রায় সমান, কখনও হয়ত বা কিছু বেশি। একে 'পাইরিক ভিক্ট্রি' বা পাইরিক জয় বলা হয়। এই ধারণাটির উৎস এপিরাসের গ্রীক রাজা পাইরাস (৩১৮-২৭২ খৃষ্টপূর্বাব্দ)-এর নাম অনুসারে। পাইরিক যুদ্ধে হেরাক্লিয়া এবং অ্যাসকুলাম-এ, যথাক্রমে ২৮০ এবং ২৭৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রোমানদের পরাজিত করতে গিয়ে গ্রীক রাজা পাইরাসের সৈন্যবাহিনীর যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার থেকেই এই 'পাইরিক ভিক্ট্রি' বা পাইরিক বিজয় কথাটির উৎপত্তি।

বিশ শতকে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে; এই যুদ্ধে ব্রিটেন ছিল একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারী। যখন যুদ্ধ শুরু হল, তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এত বিস্তৃত ছিল যে স্কটিশ সংবাদপত্র, *ক্যালেডনিয়ান মার্কারি* অনুসারে বলাই যায়:

তাঁর সাম্রাজ্যে কখনও সূর্যাস্ত হয় না।[২] কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে ব্রিটেনের শক্তি কমতে থাকে, এবং সাম্রাজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারার কারণে, উপনিবেশগুলিকে স্বাধীন ঘোষণা করা ছাড়া তার উপায়ান্তর ছিল না। ভারতবর্ষও এর মধ্যে পড়ে - ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

যুদ্ধের সবথেকে বড় অসুবিধা এই যে এর ফলাফল কী হবে, তা আগে থেকে বোঝা যায় না। ইতিহাসে এমন কোনো যুদ্ধ ঘটে নি যার ফলাফল সম্পর্কে যা ভাবা হয়েছিল, বাস্তবে সম্পূর্ণরূপে তাই ঘটেছিল। যুদ্ধ এমন এক খেলা যা সম্পূর্ণভাবে অনির্ধারিত পথে চলে; যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী খাটে না এবং যুদ্ধ ধ্বংস ছাড়া নিশ্চিতভাবে আর কিছু নিয়ে আসে না। তাই, যুদ্ধ একটি কানাগলিতে ঝাঁপ দেওয়ার সামিল।

শান্তির বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। শান্তিপূর্ণ পরিকল্পনা কাঙ্ক্ষিত ফল দিয়ে থাকে। **যুদ্ধ যেন একটি কন্টকময় বৃক্ষ, সে বৃক্ষ যতই বড় হবে, তাতে কেবলমাত্র কাঁটাই জন্মাবে। যে ব্যক্তি কাঁটাগাছ থেকে ফুলের আশা করে, সে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে।** শান্তি যেন এক ফলদায়িনী বৃক্ষ যা পরিণত অবস্থায় ফল দিয়ে থাকে।

আগেকার যুগেও সহিংসতা ও যুদ্ধের পথ ক্ষতিকারক ছিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে গণবিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্রগুলির আবিষ্কার যুদ্ধের আর কোনো পথ খোলা রাখে নি। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামনে আজ একমাত্র শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের পথ খোলা আছে, সহিংস সংঘর্ষের পথ কারো জন্যই উপযোগী নয়; বড় শক্তিধর দেশগুলির জন্যও নয়।

একুশ শতকে যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যুদ্ধের সূচনা করে, তারা প্রমাণ করবে যে তারা বর্তমান বাস্তবতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ-অচেতন, অথবা, কোনো ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশে তারা নিশ্চিতভাবেই আত্মহত্যাকে তাদের লক্ষ্য করে ফেলেছে।

একদিকে, প্রযুক্তির বিকাশের ফলে বর্তমান যুগে যুদ্ধ আর কারো জন্যই গ্রহণীয় নয়। অপরদিকে, এই একই আধুনিক প্রযুক্তি যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে এত সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে যে সম্পূর্ণভাবে শান্তির পথে চলে কোনো ব্যক্তি চূড়ান্তভাবে সফল হয়ে উঠতে পারে।

যারা সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত আছে, এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন নিশ্চয় তাদের চোখ খুলে দেওয়ার কাজ করতে পারে। অভিজ্ঞতা একথা বলে যে তাদের

কাজকর্মের ফলে আজ পর্যন্ত ইতিবাচক কোনো কিছু লাভ করা সম্ভব হয় নি। তারা কোনো ব্যতিক্রম নয়। এই একই জিনিস ভবিষ্যতেও ঘটবে। যদি উগ্রপন্থীরা সন্ত্রাসের পথে অনড় থাকে, তার ফলে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি বৃদ্ধি ঘটবে।

সন্ত্রাসবাদীদের একথা বুঝতে হবে যে কোনো তরবারির নাম 'পুষ্প তরবারি' দিলেই তা ফুলে পরিবর্তিত হয়ে যায় না। অনুরূপ যদি সন্ত্রাসবাদীরা দেখতে চায় যে তাদের কর্মের দ্বারা একটি সুন্দর লক্ষ্য অর্জন করা যাবে, তাহলেও তারা অসফল থাকবে। অবিলম্বে সহিংস পথ ত্যাগ করে তাদের শান্তির পথে ফেরা উচিত।

অন্তহীন যুদ্ধ

যুদ্ধ এমন একটি কর্ম যে, একবার শুরু হলে তা আর শেষ করা যায় না। প্রত্যক্ষ যুদ্ধ বন্ধ হলেও পরোক্ষ যুদ্ধ তার স্থান নেয়। যে কোনো যুদ্ধে সর্বদাই দুটি দিক থাকে: একজন জয়ী, অপরজন পরাজিত। যেভাবেই হক, এতে যুদ্ধের অবসান হয় না। জয়ের কারণে বিজয়ী উদ্ধত হয়ে পড়েন, তিনি নিজ গুণাগুণ হিসাবে বেশি মূল্যায়ন করেন। বিজয়ের পরে বিজয়ীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা অতি তীব্র হয়ে পড়ে। তিনি আরো আরো সাফল্য আশা করেন। এই রকম ভাবনার মধ্যে যুদ্ধের বীজ নিহিত আছে, এবং এটি নানাবিধ ধ্বংসাত্মক ভাবে প্রতিফলিত হয়।

যিনি যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন, পরাজয়ের মনস্তত্ত্ব অনুসারে তিনি পরাজয় গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকেন না, তিনি আরেকবার পরাজয়ের সম্মুখীন হতে চান না। পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে না পারা তাঁর কাছে দ্বিতীয় পরাজয়ের মতই খারাপ ব্যাপার। সেই জন্য যিনি পরাজিত তিনি যাই হ'ক, কখনই পরাজয়কে গ্রহণ করেন না।

জীবনের মসৃণ কর্মধারার জন্য, যুদ্ধাবস্থার অন্ত ঘটানো প্রয়োজন। কিন্তু ইতিহাস আমাদের বলে যে যুদ্ধের মত অবস্থার অন্ত ঘটানোর ইচ্ছা বিজয়ী বা পরাজিত, কারো থাকে না। তৃতীয় কোনো পক্ষকে এই ভূমিকা পালন করতে হবে। তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপে সর্বদা যুদ্ধাবস্থা অবসানের সম্ভাবনা ঘটে।

আমরা ১৯৪৫ সালে এর একটি উদাহরণ পাই, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিরোশিমা-নাগাসাকির জাপানি শহরগুলিতে অ্যাটম বোমা ফেলেছিল। জাপান এই জঘন্য অপরাধের প্রতিশোধ নেওয়ার এবং আমেরিকাকে একটি শিক্ষা দেওয়ার গভীর প্রয়োজন অনুভব করেছিল।

সেই কঠিন সময়ে জাপানের কিছু বিচক্ষণ সাংবাদিক ও লেখক দেশজুড়ে একটি অভিযান শুরু করেন। জাপানি জনগণকে প্রশমিত করার জন্য তাঁরা বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখতে শুরু করেন। তাঁরা এই যুক্তি তুলে ধরেন যে আমেরিকা যদি তাঁদের দেশের দুটি শহরে ১৯৪৫ সালে বোমাবর্ষণ করে থাকে, তার আগে জাপানিরাও ১৯৪১ সালে

পার্ল হার্বারের নৌঘাঁটি ধ্বংস করে আমেরিকার সমূহ ক্ষতির চেষ্টা করেছিল। তাঁরা দেশবাসীর কাছে হিংসা ও প্রতিশোধের পথ ত্যাগ করে নতুনভাবে দেশগঠনে মনোনিবেশ করার আবেদন জানান। জাপানিরা এই বিচক্ষণ পরামর্শের গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং প্রতিশোধের বাসনা ত্যাগ করেন। এরপর তাঁরা আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতার পথে পা বাড়ান। অচিরেই সকলে এর ফল দেখতে পেল: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত ধ্বংস ও বিপর্যয় কাটিয়ে জাপান অতি দ্রুত একটি উন্নত রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

ভারত এবং পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান গঠিত হয়। সেই সময় থেকে দুই দেশের অনবরত প্রতিপক্ষতা চলতে থাকে। এবং তারপর ১৯৭১ সালে, ভারতবর্ষ সামরিক ভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫) নেতৃত্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে। এর ফলস্বরূপ পাকিস্তান বিভক্ত হয়। এই বিষয়ে বহু গ্রন্থ লেখা হয়েছে, পার্টিশন আফটার পার্টিশন এবং দ্য ডিসমেম্বারমেন্ট অব পাকিস্তান এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

এই ঘটনা পাকিস্তানিদের মধ্যে প্রভূত ক্রোধের সঞ্চার করে। সেই স্পর্শকাতর সময়ে কিছু বিচক্ষণ চিন্তাবিদের প্রয়োজন ছিল, যাঁরা কঠিন সময়ে পাকিস্তানি জনসাধারণকে শান্ত করার চেষ্টা করবেন। তাঁরা পাকিস্তানিদের এই উপলব্ধি করাতে পারতেন যে ১৯৪৭ সালের ভারতভাগে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং এখন, ১৯৭১ সালে ভারত তাদের দেশভাগে সাহায্য করেছে। সমান চালে বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। এখন অতীতকে ভুলে গিয়ে ইতিবাচক ধারায় জাতি গঠন করার সময়।

কিন্তু পাকিস্তানের কোনো চিন্তক এই উপলক্ষে অগ্রগামী হলেন না। ফলত ভারতের প্রতি পাকিস্তানের বিদ্বেষ অব্যাহত রইল। এই কারণেই পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে বহু নেতিবাচক কাজে জড়িয়ে গিয়েছে। এই সামরিক অভিযানগুলির কারণে পাকিস্তান একটি বিফল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

এই ঘটনা প্রায়শই ঘটে যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে হিংসা ও যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সেই সময়ে যুযুধান পক্ষগুলির নিজেদের পক্ষে তাদের নেতিবাচক চিন্তনকে ইতিবাচক ভাবনায় পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। তাদের নিজেদের পক্ষে হিংসার পথ ত্যাগ করে শান্তির পথে আসা সম্ভব হয় না। সেই সময়েই এক তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন হয় যে তাদের মধ্যেকার ক্রোধকে প্রশমিত করে ইতিবাচক চিন্তনকে জাগিয়ে তুলবে। যদি এই ভূমিকা পালন করার মানুষ থাকত তাহলে যুযুধান সমস্ত পক্ষকে শান্তির পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হত। কিন্তু যদি সেরকম কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করা হয়, তাহলে

গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অন্তহীনভাবে হিংসা চলতে থাকবে। এই হিংসার চক্র ততক্ষণ শেষ হয় না, যতক্ষণ না যুযুধান দুই পক্ষ একে অপরকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। বিরোধিতা প্রশমনের এটি শ্রেষ্ঠ উপায় নয়।

সংকট ব্যবস্থাপনার সমস্যা

মিশর এবং চীন একই ধরনের আন্তর্জাতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল, কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়া এবং তার ফলাফল উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা ছিল। চীন সফলভাবে তার সংকট সামলেছিল, মিশর এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল এবং তার জন্য তাকে চূড়ান্ত দাম দিতে হয়েছিল।

১৮৯৮ সালের একটি চুক্তি অনুসারে চীনের উপকূলবর্তী একটি দ্বীপ, হংকং, ৯৯ বছরের জন্য ব্রিটেনকে লীজ দেওয়া হয়েছিল। চীন এই দ্বীপটি পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিল, কিন্তু এই লক্ষ্যপূরণের জন্য সে একপাক্ষিক ভাবে কিছু করেনি। সে ব্রিটেনের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসার উদ্দেশ্যে বিনিময় শুরু করে। ৯৯ বছরের লীজ সম্পূর্ণ হওয়ার পরে, চুক্তি অনুসারে যুক্তরাজ্য চীনের কাছে ১লা জুলাই, ১৯৯৩ সালে হংকং প্রত্যর্পণ করে। এইভাবে সমস্যাটি শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান হয়।

মিশরে সুয়েজ খালের কাহিনিটা কিন্তু অন্যরকম। সুয়েজ খাল তৈরি এবং তা চালু করার জন্য ১৮৫৮ সালে সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৯ সালে খালটি খোলার সময় থেকে সংশ্লিষ্ট জমিটি ৯৯ বছরের জন্য ঐ কোম্পানিকে লীজ দেওয়া হয়। ১৯৫২ সালের অভ্যুদয়ের পরে রাজা ফারুক সিংহাসনচ্যুত হন, গামাল আব্দেল নাসের ১৯৫৬ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত মিশরের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। রাষ্ট্রপতি রূপে কিছু সময় কাটাবার পরে, ২৬শে জুলাই, ১৯৫৬ সালে তিনি ঐ খালটির জাতীয়করণ ঘোষণা করেন। কিন্তু সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানির সঙ্গে লীজ চুক্তির তখনও বারো বছর বাকি ছিল। এর থেকেই সপ্তাহব্যাপী সুয়েজ সংকট সৃষ্টি হয়। নাসেরের নীতির প্রত্যুত্তরে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং ইজরায়েলের সম্মিলিত বাহিনী মিশর আক্রমণ করে ও পরাজিত করে। পরবর্তীকালে ১৯৬৭ সালের ছয়দিন ব্যাপী যুদ্ধে, ইজরায়েলের প্রবল বিমান হানায় মিশরের বায়ুসেনা শক্তিকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দেয়।

চীন এবং মিশর উভয়েরই অন্য দেশকে জমি লীজ দেওয়া সংক্রান্ত সমস্যা ছিল। চীন বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এই সমস্যা মিটিয়েছিল, কিন্তু মিশর তা পারে নি। ফলে ইজরায়েল প্যালেস্টাইনের বিপুল অংশ অধিকার করে নেয়; এই সমস্ত অংশ আগে তার নিয়ন্ত্রণে ছিল না।

মিশর একটি সহিংস সংঘের্ষের কৌশল অবলম্বন করে এবং তার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়, চীন গ্রহণ করেছিল শান্তিপূর্ণ কৌশল এবং সে সাফল্যের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। **জীবন সংকটসমূহে পরিপূর্ণ; ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র উভয়ের জন্য একথা প্রযোজ্য। যে এই সংকট ব্যবস্থাপনার শিল্পটি বোঝে, তার সাফল্য অনিবার্য; যে এই শিল্প সম্পর্কে অবহিত নয়, সে ব্যর্থ হবেই।** সফল সংকট ব্যবস্থাপনার ফল হচ্ছে শান্তি, সংকট ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতার কারণে হিংসা, সংঘর্ষ ও যুদ্ধের সৃষ্টি হয়।

যুদ্ধের সমস্ত ঘটনাই সংকট ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। উল্টোদিকে, শান্তিরক্ষার সমস্ত ঘটনাই আসলে সংশ্লিষ্ট দলগুলির সংকট ব্যবস্থাপনার সাফল্যের সাক্ষ্য বহন করে। শান্তিতে বাঁচতে হলে সবাইকে সংকট ব্যবস্থাপনার শিল্প আয়ত্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আর কোনো কার্যকরী বিকল্প নেই, ব্যক্তিদের জন্য নয় রাষ্ট্রগুলির জন্য ও নয়।

সংকট ব্যবস্থাপনার জন্য ধৈর্য এবং বিচক্ষণ পরিকল্পনার প্রয়োজন। যার এই গুণগুলি আছে, সে যে কোনো সমস্যার মোকাবিলা করতে পারবে, তা যতই গভীর হক না কেন।

সংকট ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়ায় নিজস্ব কিছু অধিকার হারাবার মূল্য ব্যক্তিকে দিতেই হয়। কিন্তু এই ক্ষতি সাময়িক এবং কম গুরুত্বপূর্ণ।সংকটটি ব্যবস্থাপিত হওয়ার পরে যে স্বাভাবিকতা ফিরে আসে তাতে পূর্বের ক্ষতি সম্পূর্ণ পূরণ হওয়া সম্ভব। এবং প্রায়শ দেখা যায়, যা ছাড়তে হয়েছে, আসলে তার থেকে অনেক বেশি ফেরৎ আসে।

বর্তমান অবস্থায়, যে রাষ্ট্র সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত সে পরিষ্কার ভাবে তার সংকট ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা প্রকাশ করে। এই অবস্থায় আজ রাষ্ট্রগুলির নিজেদের অগ্রাধিকার পুনর্বিবেচনা করা এবং সংকট ব্যবস্থাপনার একটি পদ্ধতি তৈরির চেষ্টা করা প্রয়োজন। যদি তারা তাদের সহিংস নীতিগুলি চালাতে থাকে, তাহলে কেবলমাত্র তাদের ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

যে কারো পক্ষেই হিংসার পথ অবলম্বন করা গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়ার সামিল এবং যত তাড়াতাড়ি তার থেকে বের হয়ে আসা যায়, ততই মঙ্গল। ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৫৫-১৯৭৫) এইরকম একটি উদাহরণ যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কুড়ি বছর লিপ্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত তাকে স্বীকার করতে হয় যে তার কর্মের কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাচ্ছিল না, এবং শেষপর্যন্ত একপক্ষীয় ভাবেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তারা স্বেচ্ছা-অপসরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত সেই সুপরিচিত প্রবাদের উদাহরণ: না হওয়ার চাইতে দেরিতে হওয়া ভালো!

সংকট ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা থেকে হিংসা এবং যুদ্ধের সৃষ্টি হয়। তুলনায়, সংকট ব্যবস্থাপনায় সফল হলে তা শান্তির সূচনা করে। সংকট ব্যবস্থাপনার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। যদি সংকটকালে কোনো মানুষ ধৈর্যশীল প্রমাণিত হন, তাঁর মন স্বাভাবিকভাবে কাজ করবে এবং অতি সত্বর তা একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে পাবে। বিপরীতে, যদি সংকটকালে মানুষ ধৈর্যচ্যুত হয়ে যান, তাঁর মানসিক সমতা হারিয়ে ফেলেন, তাঁর মন দক্ষতার সঙ্গে কাজ করবে না এবং তিনি অবধারিতভাবে সংঘর্ষের পথ বেছে নেবেন।

ঐতিহাসিক স্থিতাবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখো

একটি মাত্র নিশ্চিত নীতির উপর সমাজে শান্তি গড়ে উঠতে পারে - তা হল স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। যদি কেউ এই স্থিতাবস্থার পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে, তা হলে তা অবশ্যই সহিংসতার বাঁধ খুলে দেবে। বিপরীতে, স্থিতাবস্থা গ্রহণ করলে সমাজে শান্তি আসে।

মুসলমানের জন্য সর্বাধিক পবিত্র স্থানের নাম কা'বা। বিশ্বাস করা হয় যে পয়গম্বর ইব্রাহিম খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে মক্কা শহরে এই কা'বা নির্মাণ করেছিলেন। তা ছিল হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের বহু শতাব্দী পূর্বে। আজ এটি একটি বর্গক্ষেত্র ভিত্তির উপর বসানো ঘনক্ষেত্র। কিন্তু হজরত ইব্রাহিম যখন এই ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, তখন এটির ভিত্তি ছিল আয়তক্ষেত্রাকার। ৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কা'বার এই আকৃতিই ছিল; সেই সময় একটি বন্যাজনিত ক্ষতির পরে মক্কাবাসীরা এর পুনর্নির্মাণ শুরু করেন। তখন তার আকার পরিবর্তিত হয়ে ভিত্তিটি বর্গক্ষেত্রাকার হয়।

হজরত মহম্মদের উদ্দেশ্য ছিল হজরত ইব্রাহিমের ধারাটিকে পুনরুজ্জীবিত করা। তিনি কিন্তু কা'বাকে তার পুরানো রূপে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। তিনি কা'বার এই 'খন্ডিত' রূপেই তাকে রেখেছিলেন।

সহিহ্ আল-বুখারির একটি হাদিসে এর কারণ উল্লিখিত আছে। সেটি এই যে, হজরত যদি কা'বার আকৃতি পরিবর্তনের চেষ্টা করতেন, তাহলে হয়ত একটি বিতর্কের সৃষ্টি হত, তার ফলে হজরতের শান্তিপূর্ণ প্রকল্প ব্যাহত হতে পারত।[১] সেই কারণে হজরত মহম্মদ তাঁর সময়ে যে রূপ আকৃতিতে কা'বা পেয়েছিলেন, তাকে সেই রকম অবিকৃত রেখেছিলেন।

হজরতের এই 'সুন্নাহ' বা ব্যবহারিক আচরণ আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির দিক নির্দেশ দেয়; সেটি এই যে ঐতিহাসিক স্থিতাবস্থাকে কখনও পরিবর্তন করা উচিত নয়। দীর্ঘকালীন স্থিতাবস্থায় পরিবর্তন সূচনার চেষ্টার ফলাফল নিশ্চিতভাবে গভীর হয়ে থাকে, তার মধ্যে হিংসার সম্ভাবনাও থাকে। মুসলমানদের পরবর্তী ইতিহাসে এই বক্তব্যের সমর্থনে অনেক উদাহরণ আছে।

একটি আইনি কমিশনের অধিকার বলে, ভাগ হয়ে যাওয়ার আগে প্যালেস্তাইনের উপর ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই আইনি অনুশাসনের বলে ব্রিটিশরা ১৯২৩ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত প্যালেস্তাইনের উপর শাসন চালিয়েছিল। তার আগে পর্যন্ত প্যালেস্তাইন সাবেক ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। ১৯১৭ সালে বালফোর ঘোষণাপত্র অনুযায়ী ব্রিটিশরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে প্যালেস্তাইনকে ইহুদিদের ‘জাতীয় বাসভূমি’ হিসেবে গড়ে তোলা হবে। বালফোর ঘোষণাপত্রকে আরো শক্তিশালী করে ১৯২৩ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত প্যালেস্তাইনে ব্রিটিশ রাজ চলেছিল।

১৯৪৭ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্যালেস্তাইনকে দ্বিখন্ডিত করে দুটি পৃথক রাষ্ট্র তৈরির প্রস্তাব পেশ করে। এর মধ্যে একটি রাষ্ট্র আরবদের জন্য হওয়ার কথা ছিল, অপরটি ইহুদিদের জন্য। জেরুজালেম শহরের জন্য একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক শাসনের প্রস্তাব করা হয়েছিল।

হাসান আল-বান্না, সৈয়দ কুতুব্ এবং গামাল আব্দেল নাসের এই দেশভাগ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তাঁরা আরব শাসনের অধীনে প্যালেস্তাইনকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন।

বহু আত্মত্যাগ সত্ত্বেও, আরবদের এই প্যালেস্তিনীয় ‘জিহাদ’ কেবল মাত্র প্রতি-উৎপাদক হয়ে ওঠে। এই সময় বহু সুযোগ হাতছাড়া হয় এবং বহু ক্ষতি ঘটে।

একটি স্থিতাবস্থা কখনও হঠাৎ তৈরি হয় না, বহু বছর ধরে বিবিধ উপাদান একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে স্থিতাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁরা সেই সমাহিত স্থিতাবস্থা পাল্টাতে চান, কখনই অনুকূল উপাদান পুনঃ উপস্থাপিত করার অবস্থায় থাকেন না। কাম্য উপাদানগুলি একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে; শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মকান্ড বা উত্তেজনা-বিক্ষোভের দ্বারা তা সম্ভব নয়।

এটি একটি ঐতিহাসিক বাস্তব। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বাস্তবটি গ্রহণ করে নিলে স্থিতাবস্থাকে গ্রহণ করা হয়। যে এই বাস্তবটি মেনে নেবে না, সে স্থিতাবস্থাটি পাল্টাতে চাইবে; এটি কখনই সম্ভব নয়।

শান্তি একটি ইতিবাচক অবস্থাসমূহের সমাহার, ইতিবাচক পরিকল্পনা ব্যতীত কখনই তার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সমাজে হঠাৎ শান্তি আসে না: এর জন্য দীর্ঘ সময় ধরে সুচিন্তিত বিচক্ষণ প্রয়াস প্রয়োজন ।

অপরদিকে, যুদ্ধ একটি নেতিবাচক ঘটনা, কোনো রকম পরিকল্পনা ছাড়াই তা সম্ভব। যাঁরা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান তাঁদের এই বিষয়টি মনে রাখা উচিত; অন্যথায়, তাঁদের উদ্যোগ কখনই সফল হবে না।

স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের প্রচেষ্টার অর্থ অন্য মানুষদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া নয়। এটি ইতিহাসের নিয়মের বিরুদ্ধে লড়াই করার সামিল। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীই ইতিহাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তিশালী নয়। স্থিতাবস্থা-কে গ্রহণ করার অর্থ ইতিহাসকেই গ্রহণ করা আর স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের প্রয়াস ইতিহাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সামিল। এমতাবস্থায়, একজন মানুষের কাছে একটিই পথ খোলা আছে। সে ঐতিহাসিক বাস্তবকে স্বীকার করে তার কাছে যা কিছু সম্পদ প্রাপ্ত আছে তার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণভাবে নিজের কর্মধারা পরিকল্পনা করতে পারে।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা

প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে শান্তির ক্ষমতা যুদ্ধের ক্ষমতা থেকে অনেক বেশি। মানব ইতিহাসে বারবার এই নীতির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতাগুলি এই বিষয়ে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়।

সমান্তরাল উচ্চাশা নিয়ে জাপান ও জার্মানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯ - ১৯৪৫) অংশগ্রহণ করেছিল। জাপানের লক্ষ্য ছিল এশিয়ার এক নম্বর দেশ হয়ে ওঠার এবং জার্মানির লক্ষ্য ছিল ইওরোপের এক নম্বর দেশ হয়ে ওঠবার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছয় বছর চলেছিল, যে সময়ে জার্মানি এবং জাপান বহু প্রাণ ও সম্পদ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিল। যুদ্ধের শেষের দিকে দেখা যায় দুটি দেশই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে।

যুদ্ধশেষে দুই দেশেই নতুন নেতাদের উত্থান হয় যারা বিচক্ষণতার সঙ্গে তাদের জনগণকে নেতিবাচক চিন্তাভাবনার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করে। যেমন, জাপানের সম্রাট হিরোহিতো এই যুদ্ধে জাপানি পরাজয় বিষয়ে দেশের সামনে একটি ভাষণ দেন। ১৫ই অগাষ্ট, ১৯৪৫ সালে জাপানের জাতীয় রেডিও-য় এক সম্প্রচারে তিনি বলেন:

‘সময় এবং নিয়তির নির্দেশানুসারে আমরা বহু অনাগত প্রজন্মের শান্তির জন্য পথ প্রশস্ত করার সঙ্কল্পে অসহনীয়কে সহ্য করেছি, যে ক্লেশ ভোগ করার অতীত তাই ভোগ করেছি।’[১]

জাপানি সম্রাটের এই বার্তা, যার লক্ষ্য ছিল দেশের জন্য একটি প্রগতিশীল ভবিষ্যৎ নির্মাণ, জাপানি জনগণের জন্য কর্মপদ্ধতির একটি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশ করেছিল। যুদ্ধোত্তর জাপানের পরিকল্পনার মধ্যে কোথাও প্রতিশোধের কোনো প্রস্তুতি ছিল না। এই শান্তিপূর্ণ পরিকল্পনা কার্যকরী হয়েছিল, এবং ত্রিশ বছরের মধ্যে, জাপান এশিয়ার একনম্বর দেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

জার্মানির আধুনিক ইতিহাসও অনুরূপ ধারা গ্রহণ করেছিল। যুদ্ধোত্তর জার্মানির প্রথম চ্যান্সেলর (১৯৪৯-১৯৬৩), জার্মান রাজনীতিক কনরাড হার্মান জোশেফ

অ্যাডেনওয়ার (১৮৭৬-১৯৬৭) তাঁর দেশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ থেকে একটি উৎপাদনশীল সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত করেন। ইনি ছিলেন একজন দক্ষ কূটনীতিক যিনি জার্মানির বৌদ্ধিক নেতৃত্বের সূচনা করেছিলেন; সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ধারায় জার্মানির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর নীতি তাঁর পূর্বসূরী অ্যাডল্ফ হিটলারের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল - হিটলার তাঁর আগ্রাসী নীতির দ্বারা জার্মানির পরাজয় ও ধ্বংস ডেকে এনেছিলেন। অ্যাডেনওয়ারের শান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে, জার্মানি ধীরে ধীরে যুদ্ধকালীন ক্ষয়ক্ষতি সামলে ইওরোপের একনম্বর দেশ হয়ে ওঠে।

যাঁরা এখনও মনে করেন যে হিংসার দ্বারা বা যুদ্ধ করে নিজেদের লক্ষ্য অর্জন করবেন বিশ শতকের এই সমস্ত অভিজ্ঞতা তাদের চোখ খুলে দিতে পারে। ইসলামি ইতিহাসেও অজস্র অনুরূপ উদাহরণ আছে।

ত্রয়োদশ শতকে, তাতার এবং মোঙ্গল সৈন্যবাহিনীরা আব্বাসীয় খিলাফতকে আক্রমণ করে, সমরখন্দ থেকে আলেপ্পো পর্যন্ত সমস্ত কিছু ধ্বংস করেন। ঘটনাক্রমে মুসলমানদের সঙ্গে মোঙ্গলদের কিছু সংঘর্ষ ঘটে এবং মুসলমানরা শেষ পর্যন্ত পর্যুদস্ত হয়। তাদের সমস্ত যুদ্ধ বৃথা হয়। মুসলমানরা এতটাই মনোবলহীন হয়ে পড়েন যে তাঁরা বলতে শুরু করেন:

'যদি কেউ বলে মোঙ্গলরা পরাজিত হয়েছে, সে কথা কখনও বিশ্বাস কর না।'[২]

তারপর একটি নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়, মুসলমানরা বাধ্যত হিংসা ত্যাগ করে শান্তিপূর্ণ পথ অবলম্বন করেন। বৃটিশ প্রাচ্যবিদ টি. ডব্লু. আর্নল্ড (১৮৬৪-১৯৩০), তাঁর বই, *দ্য প্রীচিং অব ইসলাম*-এ দেখিয়েছেন যে এই শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির ফলে বহু মোঙ্গল পরে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩] অতএব যুদ্ধের দ্বারা যে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব ছিল না, তা শান্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হল।

এ কাহিনির বিবরণ দিয়ে লেবানিয় আমেরিকান পন্ডিত ফিলিপ কে হিট্টি (১৮৮৬-১৯৭৮) লেখেন:

'যেখানে তাদের অস্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল, সেখানে মুসলমানরা তাঁদের ধর্ম দ্বারা জয় করতে সক্ষম হন।'[৪]

ইসলামের ইতিহাস মুসলমানদের জন্য একটি শক্তিশালী বার্তা বহন করে - সহিংস সংঘাতের মধ্য দিয়ে অভীষ্ট অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার পরে, আজ আবার মুসলমানদের জন্য সেই সময় এসেছে যখন তারা সমস্ত রকম হিংসা ত্যাগ করে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির মাধ্যমে নিজস্ব লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করতে পারে।

যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে অস্ত্রসমূহের আগ্রাসী ব্যবহারের উপর এবং এটি কেবলমাত্র ধ্বংসের উৎস হতে পারে। যুদ্ধ এবং হিংসার মাধ্যমে গঠনমূলক কোনো কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। বিপরীতে, ইতিবাচক পরিকল্পনা এবং শিক্ষার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শান্তি অনিবার্যভাবে প্রগতি ও উন্নতির পথে নিয়ে যায়। সমগ্র মানব ইতিহাস একথার সাক্ষ্য বহন করে।

নেতিবাচক চিন্তনের প্রভাবে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, অতএব তার ফলাফল ও নেতিবাচক। অপর দিকে, ইতিবাচক চিন্তনের প্রভাবে শান্তিপূর্ণ পরিকল্পনা সম্ভব হয়।

সেই কারণে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির সাফল্য অনিবার্য। নির্মোহভাবে পাঠ করলে, ইতিহাস আমাদের জন্য অনেক মূল্যবান শিক্ষা আনে। সমগ্র ইতিহাস জুড়ে যুদ্ধের মাধ্যমে কারো পক্ষে কোনো অর্জন সম্ভব হয় নি, ঠিক যেমন শান্তিপূর্ণ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে কেউ কখনও নেতিবাচক ফললাভ করে নি।

ইতিহাস আসলে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক, উভয়প্রকার মানব অভিজ্ঞতার দলিল। এই দলিলের অন্তর্নিহিত মর্মার্থ এই যে ইতিহাসের নেতিবাচক অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয়: আমাদের উচিত শুধুমাত্র সেই অভিজ্ঞতাগুলির পুনরাবৃত্তি করা যা অতীতে ইতিবাচক ফল প্রকাশ করেছে।

বিভিন্ন বইয়ে মানুষের অতীত ইতিহাস লেখা আছে - সেই বইগুলি বিশ্বের সর্বত্র বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সহজে পাওয়া যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে ধেয়ে যাওয়ার আগে, ভবিষ্যৎ - যোদ্ধাদের জন্য একটি সুপরামর্শ হবে পথনির্দেশনার্থে এই গ্রন্থাগারগুলিতে যাওয়া। ইতিহাসের এই ঘটনা বিবরণীর একটি অন্তরঙ্গ পাঠের পরে - যা আমাদের গত সহস্রাব্দের মানবজীবনের ঘটনাবলীর নেতিবাচক এবং ইতিবাচক পর্বগুলি সম্পর্কে অবহিত করে - মানুষ তার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী পরিকল্পনা করতে পারে।

যদি তুমি সবুজ গাছে ভরা একটি বাগানের দিকে তাকাও, একটি পাহাড় কিংবা সমুদ্রের দিকে; যদি তুমি প্রকৃতিজগতের দিকে তাকাও, এই তারা-ভরা মহাকাশের দিকে তাকাও, তাহলে বুঝবে সর্বত্র এক চূড়ান্ত শান্তি এবং সমাহিতভাব বিরাজ করে। হিংসা ও সংঘর্ষের দ্বারা কেবলমাত্র মানবজীবন বিষময় হয়ে ওঠে। এই অর্থে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে মানুষই একমাত্র প্রাণী যে অন্য সবকিছুর থেকে আলাদা। যাঁরা যুদ্ধ-বিগ্রহ-সন্ত্রাসে লিপ্ত, তাঁরা যদি এই বেমানান-ভাবের বিষয়ে সামান্য ভাবতেন, তাহলে তাঁরা নিজেদের আচরণ বিষয়ে লজ্জাবোধ করতেন। তাঁরা তৎক্ষণাৎ হিংসার পথ ত্যাগ করে শান্তির সংস্কৃতি অবলম্বন করতেন।

কোরানের একটি আয়াতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে:

'দেশজুড়ে ভ্রমণ কর এবং দেখ অস্বীকার- কারীদের কী পরিণতি হয়েছিল' (৬:১১)।

এর তাৎপর্য এই যে অস্বীকার - কারীদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তা শুধু অপুরস্কার নয়, তা দন্ডমূলকও; এবং যারা অকারণ দ্বন্দ্ব সংঘাতে ব্যাপৃত, তাদের জন্যও একটি অনুরূপ পরিণতি অপেক্ষা করে আছে। এর থেকে বোঝা যায় যে মনোযোগ সহকারে মানব ইতিহাস পাঠ করে, তার থেকে পাওয়া শিক্ষাগুলি সম্পূর্ণ অনুধাবন করে নিজেদের কর্মপরিকল্পনা করা উচিত।

পঞ্চম অধ্যায়

একটি প্রতি-আদর্শের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান যুগে মুসলমানদের প্রসঙ্গ

বলা হয়ে থাকে যে সারা বিশ্বজুড়ে মুসলমানরা সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত। মুসলমানদের মধ্যে কেউ প্রত্যক্ষ, কেউ পরোক্ষ সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত। চরমপন্থী চিন্তনকেও অপ্রত্যক্ষ হিংসা বলা যেতে পারে, বন্দুকের সংস্কৃতি গ্রহণ করলে তা প্রত্যক্ষ হিংসা হয়ে ওঠে।

এই প্রক্রিয়াটি মুসলমান ব্যবহারিকতার সঙ্গে যুক্ত এবং এর সঙ্গে ইসলামি শিক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। সত্য এই যে, কোরান অনুসারে, মুসলমানরা মানবতার সামনে ঈশ্বরের সাক্ষী, অথবা *সুহাদা 'আলা আন-নাস* (২:১৪৩)। ইহুদিদেরও এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। বাইবেলে বলা হয়েছে;

'অতএব তোমরা আমার সাক্ষী, ঈশ্বর একথা বললেন।[১] কোরানের তৃতীয় অধ্যায়ে এ কথা বলা হয়েছে যে:

"ঈশ্বর তাদের সঙ্গে একটি চুক্তি করলেন যাদের

বই দেওয়া হয়েছিল এই উদ্দেশে যে তারা সেটি লোকের

কাছে পরিচিত করাবে এবং গোপন করবে না। কিন্তু তারা

গ্রন্থটিকে তাদের পিছনে রাখল এবং সামান্য

অর্থের জন্য তা বিনিময় করল (৩:১৮৭)।

ইহুদিরা ছিল গ্রন্থের মানুষ (আহ্ল-এ-কিতাব)। কিন্তু তাদের ইতিহাসের পরের দিকে তারা তাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয় এবং সাক্ষী হওয়ার ধারণাটি পরিত্যাগ করে। ইহুদি শ্রেষ্ঠতার তত্ত্ব দিয়ে তারা এটি বদল করে। একই জিনিস ঘটেছে মুসলমানদের সঙ্গে। তারা এখন মুসলমান শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে ভাবে।

মুসলমান ইতিহাসের পরবর্তী পর্বে যে মুসলমান চিন্তন গড়ে ওঠে তার সবটাই গড়ে উঠেছে মুসলমান শ্রেষ্ঠতার ভিত্তির উপরে। এটি এইভাবে বলা যায় 'নাহ্নু খুলাফা আল্লাহ্ ফিল আর্জ' (আমরা পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করছি)।

পরবর্তীকালের মুসলিম সাহিত্য, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে, বৃহৎ আকারে এই ধারণাটি তুলে ধরে। এবং এই ধারণাটি বর্তমান সময়ে আরো জোরালো ভাবে দুজন মুসলমান চিন্তাবিদ উজ্জীবিত করেছেন, আরব জগতে মিশরীয় সৈয়দ কুতুব (১৯০৬-১৯৬৬) এবং আরব জগতের বাইরে পাকিস্তানি সৈয়দ আবুল আলা মওদুদি (১৯০৩-১৯৭৯)। এই ধারণাটি, বর্তমান শতাব্দীতে যা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, শেষ পর্যন্ত জিহাদের নামে সন্ত্রাসবাদকে বাড়িয়ে তুলছে।

জিহাদ শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'চুড়ান্ত সংগ্রাম'। এই শব্দটির যথার্থ ব্যাখ্যা হবে 'মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম।'

বর্তমান কালের মুসলমান সংগ্রামীরা নিজেদের মত করে একটি জিহাদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ পৃথিবীতে দৈব শাসন প্রতিষ্ঠা করা, এবং সেই লক্ষ্যে তাঁরা নিজেদের সামরিক তৎপরতাকে 'জিহাদ' নাম দিয়ে একটি ধর্মীয় যৌক্তিকতা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। এই কারণেই বর্তমানে মুসলমান সামরিক তৎপরতা এত বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, এর প্রবক্তারা এই সামরিক তৎপরতাকে 'যুক্তিপূর্ণ' বা আদর্শভিত্তিক বলে মনে করেন। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁরা সমস্ত ধরনের সহিংসতা, এমনকি আত্মঘাতী বোমাহানাকেও বৈধতা প্রদান করেছেন।

এখন প্রশ্ন হল, এই সামরিক তৎপরতাকে মোকাবিলা করার উপায় কী? উত্তর এই যে, এর একটি প্রতি-আদর্শ প্রয়োজন। জঙ্গীরা তাদের সামরিক তৎপরতাকে বৈধতাদানের প্রচেষ্টায় ধর্ম গ্রন্থগুলির একটি ভুল এবং বিপথগামী ব্যাখ্যা করেছে। এর বর্তমান বৈধতা মুক্ত করতে হলে অপব্যাখ্যাগুলি সঠিক ব্যাখ্যার দ্বারা পাল্টাতে হবে। অন্য কোনো কৌশল এ ক্ষেত্রে কাজ করবে না।

মানুষ একটি যুক্তিবাদী প্রাণী। তার মনের কাছে আবেদন যথার্থ ও যুক্তিপূর্ণ হলে সে সবকিছুই গ্রহণ করে এবং মুসলমান জঙ্গীরা এই নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না।

এখানে আমি খুব প্রাসঙ্গিক একটি গল্প বলতে চাই। একবার প্যালেস্তাইন গিয়েছিলাম, সেখানে কিছু আরব ছেলেদের দেখি, তারা দল বেঁধে গান গাইছিল। সেই গানের একটি লাইন ছিল: হালুম্মা নুকাতিল হালুম্মা নুকাতিল ফা ইন্না আল-চিতাল সাবিল অর-রাশাদি

(চলো আমরা যুদ্ধ করি, চলো আমরা যুদ্ধ করি, কারণ যুদ্ধই সাফল্যের পথ!)

আমি তাদের বললাম যে আরো ভালো হয় যদি তারা এই ভাবে গায়;

হালুম্মা নুসালিম হালুম্মা নুসালিম ফা ইন্না আস-সালামা সাবিল আর-রাশাদি

(চলো আমরা শান্তি (প্রতিষ্ঠা) করি, চলো আমরা শান্তি (প্রতিষ্ঠা) করি, কারণ শান্তিই সাফল্যের পথ!)

আরব ছেলেরা আমার মত গ্রহণ করল এবং আমার বক্তব্য গ্রহণ করার আগ্রহ দেখাল। কিন্তু তার সঙ্গে তারা এও বলল যে, তারা শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। অতএব তারা যদি শান্তির পথ গ্রহণ করে, তাহলে কী হবে?

আমি তাদের ব্যাখ্যা করলাম: 'তোমরা ভুলবশত অন্যদের শত্রু ভেবেছ। তারা তোমাদের শত্রু নয়, তোমাদের মাদ'উ, অর্থাৎ যাদের কাছে ঈশ্বরের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে।

কোরান (৮৫:৩) অনুসারে, মুসলমানরা শহীদ (সাক্ষী) এবং সমস্ত মানবজাতি মাশ্‌হুদ (যাদের লক্ষ্য করা হচ্ছে)। আমাদের দায়িত্ব হল সমগ্র মানবজাতির কাছে ঈশ্বরের বার্তা পৌঁছে দেওয়া। তারপর আমি তাদের বললাম যে তাদের সহিংস পদ্ধতির কোনো ফল হয় নি; কিন্তু যদি তারা শান্তিপূর্ণ দাওয়াহ্ কর্মে যুক্ত হয়, তাহলে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাদের এই কাজে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। কোরানে যেমন বলা হয়েছে:

'ঈশ্বর নিশ্চয় তাদের সাহায্য করবেন যারা তাঁর কারণকে সহায়তা করে - ঈশ্বর অবশ্যই শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান' (২২:৪০)।

ঐ আরব ছেলেরা আমার কথা শুনে খুবই খুশি হয়েছিল এবং তাদের একজন নিকটবর্তী একটি জলপাই বৃক্ষ থেকে একটি ডাল ভেঙে এনে আমার হাতে দিল। এটি শান্তির প্রতীক। মানব প্রকৃতি সম্পর্কে বলা যায় যে এই অভিজ্ঞতা বিশ্বের সর্বত্র মুসলমাদের জন্য প্রযোজ্য।

একটি সাহিত্য বোমা প্রয়োজন

মিলোভান ডিলাস (১৯১১-১৯৯৫) যুগোশ্লাভিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি অল্প বয়সে কমিউনিজম দ্বারা প্রভাবিত হন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি ফেডারেল পিপাল'স রিপাবলিক অব যুগোশ্লাভিয়ার উপরাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি কমিউনিজমের বাস্তব ফলগুলি দেখলেন, তিনি কমিউনিস্ট শাসনের কঠোর সমালোচক হয়ে উঠলেন।

১৯৫৭ সালে ডিলাসের একটি বই প্রকাশিত হয়, *দ্য নিউ ক্লাস: অ্যান অ্যানালিসিস অব দ্য কমিউনিস্ট সিস্টেম।* সেখানে তিনি দেখান যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইওরোপের কমিউনিজম মোটেই সাম্যবাদী ছিল না, এটি এক শ্রেণীর নতুন ক্ষমতাভোগী পার্টি আমলাদের প্রতিষ্ঠা করছিল, যারা নিজেদের অবসস্থান অনুসারে বস্তুগত বহু সুবিধা ভোগ করছিলেন। এই বইটি খুব সফল হয় এবং চল্লিশটিরও বেশি ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছিল।

বিশ্বজুড়ে এই বইটির সমালোচনা লেখা হয়েছিল। রিডার্স ডাইজেস্ট 'দ্য বুক দ্যাট ইজ শেকিং দ্য কমিউনিস্ট ওয়ার্ল্ড' (কমিউনিস্ট বিশ্বকে টলিয়ে দিচ্ছে যে বই) শিরোনামে বইটির সমালোচনা প্রকাশ করে।[১] কমিউনিস্ট রাশিয়ার প্রতি আমেরিকা প্রবল বিদ্বিষ্ট ছিল, কিন্তু সে রাশিয়ার উপর কোনো পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ না করে কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে একটি সাহিত্যনির্ভর বিরুদ্ধ প্রচার নির্মাণ ও সমর্থন করে। বিভিন্ন ভাষায় যথেষ্ট সংখ্যক বই প্রকাশ করে কমিউনিজমের দর্শনগত ত্রুটি-বিচ্যুতি গুলি প্রচার করা হয়। এই কৌশল সফল হয়েছিল এবং উনসত্তর বছর টিকে থাকার পরে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে পড়ে।

বর্তমান কালের তথাকথিত ইসলামি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে মোকাবিলা করার জন্য এটিই সঠিক পথ। **রাসায়নিক বা পারমাণবিক বোমার সাহায্যে এই জাতীয় সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা যাবে না। একটি সাহিত্য বোমার প্রয়োজন যাতে মানুষ সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করে শান্তির পথ অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত হয়।** বর্তমান সময়ে সন্ত্রাসবাদের বিভীষিকা নিয়ন্ত্রণের জন্য এই বিষয়ে একটি শক্তিশালী বইয়ের প্রয়োজন, যে বইয়ের

পুস্তক সমালোচনা প্রকাশিত হবে এই শিরোনামে : ‘সন্ত্রাসবাদী বিশ্বকে টলিয়ে দিচ্ছে যে বই’।

একটা সময় ছিল যখন মনে করা হত যে সাদ্দাম হুসেন আধুনিক মুসলমান সন্ত্রাসবাদের বৃহত্তম পৃষ্ঠপোষক। গণহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করে তাঁকে ২০০৬ সালে ফাঁসি দেওয়া হয়। সাদ্দাম হুসেনের পরে, ওসামা বিন লাদেন, যাঁকে সন্ত্রাসবাদের পরবর্তী প্রধান নেতা মনে করা হয়, তাঁকেও আত্মগোপন করে থাকা স্থানে বোমা ফেলে ২০১১ সালে হত্যা করা হয়। তারও পরে আবু বকর আল বাগদাদীকে সবথেকে ভয়ংকর সন্ত্রাসবাদী মনে করা হত। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে এক বায়ুহানায় তিনি নিহত বা গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন।

তবুও এই সমস্ত নেতাদের হত্যার পরেও, ইসলামের নামে সন্ত্রাস আজও রমরমা করে চলছে। এর থেকে স্পষ্ট যে এই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে হবে। বন্দুক-বোমার বাইরে আমাদের একটি কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

সংবাদ প্রতিবেদন অনুসারে, ১০ই জুন, ২০১৫ তারিখে, মসুলের পতনের বার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা ইরাকে উপস্থিত সাড়ে তিন হাজারের উপর আরো অতিরিক্ত ৪৫০ সামরিক উপদেষ্টা নিয়োগ করার আদেশপত্র জারি করেন। পাশাপাশি, তিনি স্বীকার করে নেন যে, তাঁর আই এস-বিরোধী কৌশল কাজ করছে না।[২]

অভিজ্ঞতা অনুসারে, এই বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী কৌশল গ্রহণ করতে হবে। সন্ত্রাসবাদের আতঙ্ককে শেষ করতে চাইলে আমাদের পূর্ববর্তী মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। রাসায়নিক বোমাবাজির পরিবর্তে আমাদের সাহিত্য বোমা ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে এটিই সাফল্যের একমাত্র উপায়।

ইসলামি সাহিত্যের সম্পূর্ণ অপব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে ইসলামের নামে আধুনিক সন্ত্রাস গড়ে উঠেছে। কোরানেরএকটি আয়াতের এরকম অপব্যাখ্যা করা হয়, যেখানে বলা হচ্ছে : ইন আল-হুক্‌মু ইল্লা লিল্লাহ্। অর্থাৎ, ‘সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র ঈশ্বর’ (১২:৪০) ।

এই আয়াতে, ‘হুক্‌ম্’ শব্দটি ঈশ্বরের অতিলৌকিক শক্তি বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কিছু চরমপন্থী মুসলমান চিন্তক এটি রাজনৈতিক শক্তি অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁরা আরো মনে করেন যে মুসলমান হিসেবে, ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁরা পৃথিবীতে ঈশ্বরের শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন। এই ধারণা ভুল কারণ এটি

অপ্রাসঙ্গিকভাবে তুলে আনা একটি আয়াতের উপর ভিত্তি করে নিজেদের মত ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে।

কোরানের আর একটি আয়াতে আছে, 'ইদিলু'। এর অর্থ: (নিজের জীবনে) ন্যায়ের নীতি অবলম্বন কর (৫:৮)।

কিন্তু এই আয়াতের একটি অপব্যাখ্যা করে একে সকর্মক করে তুলছে - কোরানে কিন্তু এই অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি।

এই আয়াতে যে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে সরাসরি কোনো কর্মের কথা বলা নেই কিন্তু অপব্যাখ্যা করা হলে তাতে প্রত্যক্ষত কর্ম যুক্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, মানুষের উপর ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হলে তার জন্য বলপ্রয়োগ করাও চলবে। এই অপব্যাখ্যার কারণে ন্যায়ের ধারণাটির রাজনীতিকরণ ঘটেছে, যদিও মূল কোরানে এ বিষয়ে কিছু বলা হয় নি।

এই ধরনের যে কোনো ব্যাখ্যাই ভ্রান্ত। এই ভ্রান্তির কথা প্রকাশ করতে হবে যাতে মানুষ নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে যে ইসলামে বর্তমান সহিংসতার ধারার কোনো অনুমোদন নেই এবং যাতে চরমপন্থীরা নিজেদের কাজকে ইসলাম বিরুদ্ধ বুঝতে পেরে এই পথ ত্যাগ করে। ধর্মগ্রন্থের অপব্যাখ্যার ভিত্তিতেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ গড়ে উঠেছে। বিশ্বজুড়ে প্রচারিত সঠিক ব্যাখ্যার দ্বারা সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা সম্ভব। ১৯শে জুলাই, ২০১৫ তারিখে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন তরুণদের ইরাক এবং সিরিয়া গিয়ে ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড দ্য লেভান্ট (আই এস আই এল)-এ যোগদান বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন:

'আমাদের, চরমপন্থী উদ্দেশ্যগুলির বিশেষত আই. এস. আই. এল-এর, অবমহিমায়ন করতে হবে। এটি কোনো দিগন্তউন্মোচনকারী প্রবর্তক আন্দোলন নয়, এটি ত্রুটিপূর্ণ, অসৎ, পাশবিক - প্রাথমিক ভাবে ঘৃণা উদ্রেককারী।[৩]

একথা সত্য যে বর্তমান মুসলমান চরমপন্থা বিশ্বব্যাপী খিলাফতের এক নিজস্ব মহিমায়নের কারণে ঘটেছে। ইসলামিক সূত্রগুলির যে অপব্যাখ্যা চরমপন্থীরা করেছেন সেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলা মিথ্যা আদর্শের অবমহিমায়নই এর একমাত্র সমাধান হতে পারে। ভুল ব্যাখ্যার উপর গড়ে তোলা খিলাফতের ধারণা থেকে ইসলামকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে খিলাফতের মহিমা মুক্ত করা সম্ভব হবে।

এই বইয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য গ্রহণীয় যুক্তি দ্বারা এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করা যে বর্তমান রাজনৈতিক ইসলামের আসলে ইসলামে কোনো ভিত্তি নেই। ইসলামের একটি

রাজনৈতিক ব্যাখ্যার উপর ভ্রান্ত খিলাফতের বর্তমান ধারণা গড়ে উঠেছে এই বই বর্তমানে প্রচলিত খিলাফতের ভ্রান্ত আদর্শকে চূর্ণ করে। রাষ্ট্রপুঞ্জ যথার্থই এই নীতি গ্রহণ করেছে: 'যেহেতু মানুষের মনেই যুদ্ধ প্রথম শুরু হয়, মানুষের মনের মধ্যেই শান্তির প্রতিরক্ষাগুলি নির্মাণ করতে হবে'। [৪]

যদি আমরা সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে চাই আমাদের শান্তিপূর্ণ ধারায় সন্ত্রাসবাদীদের মনগুলির পুনর্নির্মাণ করতে হবে। অন্য কোনো পদ্ধতি কোনো কাজে লাগবে না।

মুসলমান তরুণদের চরমপন্থা

আজকের দিনে মুসলিম সামরিক তৎপরতার উৎস কোরান থেকেও নয়, সুন্নাহ্ থেকেও নয়। এটি প্রাথমিকভাবে মুসলমান গণমাধ্যমের ফল, যদিও সেটা ঘটেছে অনিচ্ছাকৃতভাবে। তার সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমান গণমাধ্যম যাবতীয় প্রতিবাদ সূচিত করার বাহন হয়ে উঠেছে। মুসলমান গণমাধ্যমের এই প্রতিবাদী চরিত্রই বর্তমান কালের মুসলমানদের মানসিকতা গড়ে তুলেছে। মুসলমান সামরিক তৎপরতা ও আত্মঘাতী বোমাহানা প্রধানত এই মুসলমান গণমাধ্যমের ফল।

অষ্টাদশ শতকে মুসলমান বিশ্বে ছাপাখানা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফ্রান্সের নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১) মিশরে প্রথম ছাপাখানা নিয়ে যান, যখন ১৭৯৮ সালে তিনি ঐ দেশ আক্রমণ করেন। অর্থাৎ, মুসলমান বিশ্বে ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি ছাপাখানা নিয়ে এসেছিল। এই ঘটনা কাকতালীয় যে মুসলমান বিশ্বে ছাপাখানার আবির্ভাব হল এমন একটা সময়ে যখন তাঁরা নিজেদের দেশে ঔপনিবেশিক বিস্তার লক্ষ করছিলেন।

কিভাবে পশ্চিমী শক্তিগুলি প্রত্যেকদিন কোনো না কোনোভাবে মুসলমান বিশ্বের উপর নিজেদের অধিকার বিস্তার করেছিল তার খবর থাকত। যেমন ১৭৭১ সালে রুশ-তুর্কী যুদ্ধের ক্রমে (১৭৬৮-৭৪) রুশ নৌবহর ভূমধ্যসাগরে ওসমানীয় তুর্কী নৌশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে। বৃটিশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে ১৭৯৯ সালে মহীশূরের টিপু সুলতান মৃত্যুবরণ করেন। ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষের মুঘল রাজবংশ ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। ওসমানীয় তুর্কী সাম্রাজ্য এবং ইতালির সাম্রাজ্যের মধ্যে যে তুর্কো-ইতালীয় যুদ্ধ হয়, তার ফলে ১৯১২ সালে ইতালি ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ত্রিপোলিতানিয়া অধিকার করে। মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর এই সমস্ত ঘটনার প্রভাব পড়েছিল এবং তা আরো প্রতিফলিত হয়েছিল সংবাদমাধ্যমে।

অষ্টাদশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত এই সমস্ত ঘটনায় মুসলমান জগৎ আলোড়িত হতে থাকে এবং মুসলমান প্রেসে এই ঘটনাগুলি অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করা হয়।

এইভাবে মুসলমান সংবাদমাধ্যম একধরণের প্রতিবাদী সাংবাদিকতার রূপধারণ করেছে। এখন মুসলমানরা বৈদ্যুতিন মাধ্যমকে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন।

এই ধরণের গণমাধ্যম বর্তমান দিনের মুসলমান মানসিকতা গড়ে তুলেছে। আমাদের বর্তমান সময়ে মুসলমানদের চিন্তাভাবনায় যে ধরণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তা ইসলামি শিক্ষার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, তার মূল রয়েছে মুসলমান গণমাধ্যমে, যা নিরন্তর প্রতিবাদ, ক্ষোভ ও অভিযোগের ভাষায় কথা বলে।

মুসলমান গণমাধ্যমগুলি এই ছক গ্রহণ করার ফলে মুসলমান মানসিকতা নেতিবাচক হয়ে উঠেছে। মুসলমান সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে এবং এখন তার ক্ষোভ, রাগ অন্য সম্প্রদায়গুলির উপর আছড়ে পড়ছে। যখন তারা দেখল যে তাদের বন্দুকের সংস্কৃতি থেকে উপযুক্ত ফল পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তাদের ক্রমবর্ধমান ক্রোধের কারণে, তাদের তথাকথিত শত্রুদের নির্মূল করতে তারা আত্মঘাতী বোমাহানার পথ বেছে নিল।

বর্তমানকালের মুসলমান সামরিক সক্রিয়তা যুক্তি বা ইসলামি শিক্ষা, কোনোটির উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠেনি। এটি সম্পূর্ণভাবে মুসলমান জাতির ক্ষোভ, ক্রোধ, মোহমুক্তি এবং নেতিবাচক চিন্তনের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

বলা হয়ে থাকে যে, মুসলমান তরুণদের চরমপন্থা অবলম্বন বর্তমান সময়ের সব থেকে বড় সংকট। কিন্তু প্রশ্ন হল এই চরমপন্থার উৎস কী? কোরান এবং সুন্না অবশ্যই এই চরমপন্থার আদর্শগত উৎস নয়। মুসলমানদের দ্বারা ইন্টারনেট বা সামাজিক গণমাধ্যম ব্যবহার, যা আসলে মুসলমান গণমাধ্যমের প্রসারিত রূপ, এই সংস্কৃতির ভিত্তি। ইন্টারনেট নামক আন্তর্জাতিক জালে মুসলমানদেরও সহজলভ্য অধিকার আছে এবং তারা এটি ব্যাপক মাত্রায় ব্যবহার করছে। এভাবেই তারা তাদের ওয়েবসাইটগুলি মিথ্যা ছবি ও মিথ্যা প্রতিবেদনে ভর্তি করে ফেলেছে, যা দেখায় যে মুসলমানরা একটি বিপন্ন সম্প্রদায়। সামাজিক গণমাধ্যম আজ মোবাইল ফোনে সহজলভ্য হয়ে সকলের পকেটে ঘুরছে।

আজকের মুসলমান তরুণদের চরমপন্থা গ্রহণের বিষয়ে এই ওয়েবসাইট বা ইন্টারনেট সংস্কৃতির প্রাথমিক অবদান আছে। এই নেতিবাচক সংস্কৃতি থেকে তরুণ মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য একটি ব্যাপক প্রচারকার্যের প্রয়োজন। মুসলমানদের মনকে এমনভাবে জাগিয়ে তুলতে হবে যাতে তারা ওয়েবসাইটের তথ্যগুলিকে নিজেরা বিশ্লেষণ করতে পারে এবং সত্যমিথ্যার পার্থক্যকে নিজেরা চিহ্নিত করতে পারে। বর্তমান বইটি এই বিষয়ে তাদের সাহায্য করার একটি প্রয়াস।

এই ধরনের সহিংসতাকে প্রতি-সহিংসতা দ্বারা দমন করা যাবেনা, কারণ এই প্রতি-সহিংসতা মুসলমানদের ক্ষোভ ও ক্রোধকে কেবলমাত্র বাড়িয়ে তুলতে পারে। উত্তরোত্তর বেড়ে চলা ক্রোধের কারণেই তারা আত্মঘাতী বোমাহানার পথ বেছে নিয়েছে।

বর্তমান যুগে প্রায় সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায় অভিযোগ প্রতিবাদ করতে শুরু করেছে। তাদের এই মানসিকতার কারণে তারা নেতিবাচক বিষয়গুলি সম্পর্কে বেশি গ্রহণশীল, ইতিবাচক বিষয়গুলি সম্পর্কে নয়। এই ধরনের মানসিকতার কারণে মুসলমানরা ইতিবাচক সংবাদও সন্দেহের চোখে দেখে। তারা জানে যে অন্যরা সকলেই তাদের শত্রু, তারা মানুষকে ঈশ্বরের সৃষ্টি হিসাবে দেখতে পারেনা। তারা সমস্ত ঘটনার নেতিবাচক অংশটুকুই শুধু দেখতে পায় এবং তার ইতিবাচক দিকগুলি দেখতে ব্যর্থ হয়।

মুসলমানরা একটি নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছেন, ইসলামোফোবিয়া বা ইসলাম (বিষয়ে) ত্রাস। এর অর্থ এই যে পশ্চিমী বিশ্ব ভুলক্রমে ইসলামকে অমুসলমানদের জন্য বিপদের কারণ বলে মনে করে। একথা যথার্থ নয়।

আমার মনে সামান্য পরিবর্তন করলে শব্দটি যথার্থ হবে - সেটা 'মুসলিমোফোবিয়া'।

মুসলমানরা ইসলামের নামে সহিংসতার সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। এই অর্থে পশ্চিমী বিশ্ব মুসলমানদের বিপজ্জনক মনে করতেই পারে। অথচ সমগ্র মানবিকতার জন্য ইসলাম ঈশ্বরের একটি বড় আশীর্বাদ। কিন্তু বর্তমান মুসলমানরা, তাদের নিজেদের ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করেছে এবং এই কারণে ইসলামকে সহিংসতার ধর্ম বলে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে।

'মুসলিমোফোবিয়া' অন্য আর কারো অপেক্ষা মুসলমানদের বেশি সম্বোধন করে। এটি ধর্মের অপব্যাখ্যা বন্ধ করে, মুসলমানদের বন্দুক - বোমার সংস্কৃতি পরিত্যাগ করতে বলছে, যাতে অন্যদের মধ্যে ইসলাম বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝির কোনো অবকাশ না থাকে। এই ভাবে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে একটা ইতিবাচক বোধ গড়ে উঠবে - যা ঈশ্বর তাদের জন্য ইসলাম ধর্মের রূপে পাঠিয়েছেন।

বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে, প্রশ্ন হল, রুপোলি রেখাটি কোথায়? আধুনিক যুগে মুসলমান সংস্কারকদের উচিত মুসলমান তরুণদের প্রতি মনোনিবেশ করা। অল্পবয়সে গড়ে ওঠার সময় মানুষ শর্তবদ্ধতা থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে মুক্ত থাকে, তখন সে নির্মোহভাবে ঘটনাবলীকে পরীক্ষা করতে পারে। নিতান্ত অল্পবয়সী মুসলমানদের মধ্যে

ইতিবাচক চিন্তন কিভাবে বিস্তার করা যায়, সেই জায়গা থেকেই আমাদের প্রচেষ্টা শুরু হওয়া উচিত।

আমরা আশা করি, মুসলমানদের নতুন প্রজন্ম, বিশেষ করে যারা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে, তাদের ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষা তাদের শর্তবদ্ধতা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছে। তারা অনেক বেশী নির্মোহভাবে পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছে এবং অনেক বেশী বাস্তবসম্মতভাবে সমস্ত বিষয়কে বোঝার ক্ষমতা অর্জন করছে। এই মুসলমান তরুণরাই আমাদের ভবিষ্যতের আশা।

নির্বাচিত তথ্যের কুফল

ছাপাখানা এবং বৈদ্যুতিন যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে যাকে সাধারণভাবে তথ্যের যুগ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, এই যোগাযোগের কেন তার সঙ্গে কেন ঘৃণার যুগকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে?

এ কথা পরিষ্কার যে বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় বাদ দিলে প্রায় সমস্ত গোষ্ঠীর মানুষই পরস্পরের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। এর কারণ এই যে লেখক এবং বক্তারা গণ পরিসরে যে তথ্য পরিবেশন করেন, তা নির্বাচিত। প্রতিটি গোষ্ঠী, তার নিজের স্বার্থ অনুসারে, কোনো না কোনো কারণে নির্বাচিত তথ্য দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, তার প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী সম্পর্কে সে যা তথ্য দিয়ে থাকে, তা একপেশে। মানবাধিকার কর্মী, সমাজ সংস্কারক, রাজনৈতিক নেতা, গণ মাধ্যমের সাংবাদিক, পেশাদার লেখক, সকলেই কমবেশি এই ব্যবস্থাপনায় যুক্ত।

এই জাতীয় একপেশে প্রতিবেদনের কারণে কিছু গোষ্ঠী অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই মনোভাব সুপ্ত থাকে। তবে তা সুযোগ পেলেই সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদের রূপ ধরে জ্বলে ওঠে। আজকের দিনের সন্ত্রাসবাদ এইরকম এক প্রক্রিয়ার ফসল।

এই একপেশে খবর পরিবেশনার রীতির বিষয়ে, অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা মুসলমান সম্প্রদায় অনেক বেশী জড়িত। এই বক্তব্যের সমর্থনে দুটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রথমটি সিরিয়ার মুসলমান পণ্ডিত আব্দ আর রাহমান হাসান হাবান্নাকা আল-ময়দানির লেখা একটি বই। তিনি আরবি ভাষায় *সিলসিলাহ্ অ'দা আল ইসলাম* (ইসলামের শত্রুদের উপর গ্রন্থমালা, ২০০০) নামে অনেকগুলি গ্রন্থ সংকলন করেন।

এই গ্রন্থমালার একটি বইয়ের শিরোনাম, *অজ্নিহা আল-মকর আথ-থালাথা ওয়া খাওয়াফিহা*, (চক্রান্তের তিনটি ডানা এবং তাদের আনুষঙ্গিক পালকগুচ্ছ)। তিনি এই বইয়ে ইসলাম এবং মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য তিনটি মুসলিম-বিরোধী চক্রান্ত কাজ করছে বলে দেখিয়েছেন। লেখকের মতে, এই তিনটি চক্রান্ত হলো খৃষ্টান মিশন (আল-তবশির) প্রাচ্যবাদ (আল-ইশতিশরাক) এবং উপনিবেশবাদ (আল-ইসতিমার)।

এই ধরনের চিহ্নিতকরণ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কারণ লেখক যাদের চিহ্নিত করেছেন তারা চক্রান্তকারী নয়। তাদের কাজকর্মগুলি সমস্তই তাদের নিজনিজ গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধিত্ব করে, এই মাত্র। ঠিক যেমন মুসলমানদের একটি দৃষ্টিভঙ্গী আছে, প্রতিটি গোষ্ঠীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে। এই সমস্ত উপাদানগুলি দেখার ক্ষেত্রে নির্মোহ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে এই ধরনের তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং নির্বাচিত চিন্তন অনুসারে একে চক্রান্ত বলে চিহ্নিত করা হয়। এইরকম বাছাই করার মানসিকতা দিয়ে মুসলমানদের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলে, অন্যদেরও মনে হবে মুসলমানরা চক্রান্তে জড়িত। যেমন, গণমাধ্যমের একটি সমীক্ষায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে যুক্তরাজ্যে দ্রুততম হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে ইসলাম।[১] এই তথ্যটি যদি একপেশে ভাবে পাঠ করা হয় অন্যরা ভাবতে পারেন মুসলমানরা ব্রিটেনকে ইসলামায়িত করার কোনো চক্রান্তে লিপ্ত আছে। কিন্তু যদি এই ধারাটিকে আমরা মানুষের নির্বাচনের স্বাধীনতার মাত্রায় ব্যাখ্যা করি, তাহলে দেখব যে এটি একটি স্বাভাবিক বৃদ্ধি।

উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, জাইয়নিজম (জাতিরূপে পরিগণিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ও নির্দিষ্ট বাসভূমি লাভের জন্য ইহুদীদের আন্দোলন), উপনিবেশবাদ, কমিউনিস্ট মতবাদ এবং মার্কিন বিস্তারবাদ। মুসলমানরা ভুলক্রমে মনে করেন এগুলি ইসলাম বিরোধী। এই ভুল শক্তিগুলির যুক্তিহীন পূর্বানুমানের কারণে, তাঁরা এই শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। নিজেদের কাজের যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ করতে তাঁরা এগুলিকে ইসলামের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং 'ইসলাম বিপন্ন', এই আওয়াজ তোলেন। কিন্তু এটি সত্য নয়।

এই পরিবর্তনগুলি মুসলমানদের ইসলাম বিরোধী বলে চিহ্নিত করা উচিত হয়নি। এগুলিকে তাঁদের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসাবেই গ্রহণ করা উচিত ছিল। মুসলমানদের এই ভ্রান্ত পূর্বানুমানের কারণে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

যদি মুসলমানরা তাঁদের কাজকর্ম চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বাধীন হন, তাহলে অন্যদের ক্ষেত্রেও সেই একই স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার স্বীকার করতে হবে। যদি মুসলমানরা অন্যদের চক্রান্তকারীর তকমা দেন, তাহলে অন্যরাও তাঁদের চক্রান্তকারী বলে চিহ্নিত করতে পারবেন, সেই অধিকার অন্যদের দিতে হবে। যদি তাঁদের আপত্তির কোনো ক্ষেত্র থাকে, তাহলে অন্যদের বক্তব্যের যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের অধিকার তাঁদের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু অন্যদের চক্রান্তকারী বলে চিহ্নিত করার কোনো অধিকার তাঁদের নেই। দ্বিতীয় কাজটি সরাসরি গালাগালি দেওয়ার থেকে ভালো কিছু নয়।

এতো গেল ছাপাখানার উদাহরণ। ছাপাই এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বিস্তারিত ভাবে প্রচারিত একটি উদাহরণের কথা ধরুন।

শিকাগো শহরের নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির তাহেরা আহমদ ৩০শে মে, ২০১৫ তারিখে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে যাত্রা করছিলেন। এই উড়ানপথে তিনি একটি পানীয় চেয়েছিলেন। তাঁকে জানানো হয় যে, 'আমি দুঃখিত। আমি আপনাকে একটি বন্ধ পানীয়ের পাত্র দিতে পারিনা - তাই আপনাকে ডায়েট কোক দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।' কিন্তু তাহেরা আহমদের ঠিক পাশের সহযাত্রী পুরুষটি যখন একটি সীল-করা বিয়ারের ক্যান পেলেন, আবার প্রশ্ন করে তাহেরা বিমানসেবকের কাছে এই উত্তর পান, 'আমরা মানুষদের না-খোলা ক্যান দিতে পারি না, কারণ তারা সেটি অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে পারে।' তাঁর ফেসবুকের পাতায় তাহেরা আহমদ দাবী করেন যে বিমানসেবক 'আমার বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করছিল।' এই পোস্টটির জন্য তিনি 'ইসলামোফোবিয়া ইজ রিয়াল' (ইসলামত্রাস আসলে বাস্তব) এই হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করেছিলেন। মুসলমান আন্দোলনকারীরা সামাজিক গণমাধ্যমে এই ঘটনাকে গোঁড়ামির অমার্জনীয় উদাহরণ রূপে উল্লেখ করলেন এবং ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স বর্জনের ঘোষণা করলেন। প্রকাশ্য বিভেদনীতি প্রয়োগের ব্যাখ্যার উপর তাঁদের এই সিদ্ধান্ত গড়ে উঠেছিল।[২]

এই ঘটনাটি এত তুচ্ছ যে এটি প্রায় কোনো ঘটনাই নয়, কিন্তু ঐ মুসলমান যাত্রীর দ্বারা ফেসবুকে পোস্ট হওয়ার পরে, গণমাধ্যমের কাছে এটি একটি শিহরণ জানানো খবর হয়ে ওঠে। এবিষয়ে ব্যাপক স্তরে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। গণমাধ্যমে এই জাতীয় খবর প্রায় প্রতিদিন প্রকাশিত হয়; এর ফলে অন্য সম্প্রদায়গুলির প্রতি, বিশেষত পশ্চিমের প্রতি মুসলমানদের ঘৃণা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

এই ধরনের নির্বাচিত প্রতিবেদন বর্তমান কালের সবথেকে বড় সমস্যা; এর ফলে বিশ্বজুড়ে নেতিবাচক চিন্তনের প্রসার ঘটেছে। যে সমস্ত মুসলমান লেখক ও প্রতিবেদকরা এই ধরনের সংবাদ প্রচার করেন, তাঁরাই মুসলমানদের কাছে আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠেছেন। আদর্শস্থানীয় এই ব্যক্তিরাই মুসলমানদের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী।

এই ধরণের লেখকদের বা বক্তাদের প্রবণতা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে পারি, যাতে তারা এই ধরনের ঘটনা বা প্রতিবেদনে উত্তেজিত না হয়ে পড়ে বা সেগুলি অবজ্ঞা করতে পারে; তাদের চিন্তন যাতে প্রতিকূলভাবে আক্রান্ত না হয়, সে বিষয়ে তারা সচেতন থাকতে পারে ।

এই পৃথিবীতে সকলেই স্বাধীনতা ভোগ করে। আমরা মানুষের সেই স্বাধীনতা হরণ করতে পারিনা, কিন্তু আমাদের নিশ্চয় সেই বুদ্ধিমত্তা আছে যার কারণে ভুল খবরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাবো না। অমাদের মতামত অমাদের নিজস্ব যুক্তিবুদ্ধির ভিত্তিতে গড়ে উঠবে।

আত্মঘাতী বোমাহানা

বর্তমানযুগে, আত্মঘাতী বোমাহানা হিংসার একটি অনন্য এবং ভয়ংকর প্রতিফলন। এই হিংসার ভয়ংকতম উদাহরণ ঘটেছিল নিউ ইয়র্ক শহরে, সাধারণভাবে যাকে ৯/১১ বলা হয়। এই ঘটনায় মুসলমান সন্ত্রাসবাদীরা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে দুটি টাওয়ার ধ্বংস করে। তারা চারটি যাত্রীবাহী বিমান হাইজ্যাক করে,যার মধ্যে দুটি বিমান টাওয়ারের ভিতর দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয়। এই আক্রমণের ফলে প্রায় তিন হাজার মানুষের মৃত্যু হয়, ১১০ তলা এই ভবনদুটি বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই আক্রমণের ফলে আশপাশের ভবনগুলিও ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

একথা আপাতভাবে প্রতীয়মান যে আত্মঘাতী বোমাহানার মত মারণ পদ্ধতি যারা অবলম্বন করছে, মুসলমানরা সেই তালিকার শীর্ষে আছে। অথচ, আত্মহত্যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সহিহ্ আল -বুখারিতে লিপিবদ্ধ একটি কাহিনী অনুসারে, যুদ্ধে আহত জনৈক মুসলমান যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নিজের তরবারির সাহায্যে আত্মহত্যা করেন। ইসলামে এটিই প্রথম আত্মহত্যার উদাহরণ। এই প্রসঙ্গে হজরত মহম্মদ তাঁর অনুচরদের বলেন যে ঐ ব্যক্তি নরকের মানুষের সঙ্গে স্থান পাবে।[১]

ইসলামী সাহিত্য অনুসারে, আত্মহত্যা স্পষ্টত একটি অনৈতিক কাজ। যদি তাই হয়, তবে মুসলমানরা কীভাবে বিশাল বিশাল সংগঠন স্থাপন করে অল্পবয়সীদের আত্মঘাতী হানার প্রশিক্ষণ দিতে পারছে? এই ধরনের কাজ কর্মের জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। মুসলমানদের থেকেই এই অর্থের জোগান আসছে।

অতএব এই সাংগঠনিক কর্মে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমগ্র মুসলমান সমাজ জড়িত। লেবানিজ-মার্কিন লেখক, কহ্লিল গিব্রান (১৮৮৩-১৯৩১) এর একটি কথা এক্ষেত্রে বিশেষ প্রযোজ্য:

বৃক্ষের নিঃশব্দ সম্মতি ব্যতীত একটি পাতাও তার শাখাচ্যুত হয় না।[২]

আত্মঘাতী বোমাহানার মূল কারণ এই যে বর্তমান সময়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের ভাবনা অনুসারে পৃথিবী প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত, মুসলমান ও কাফের (অবিশ্বাসী);

মুসলমান ব্যতীত আর সকলেই কাফের। যে সমস্ত দেশে মুসলমানরা শাসন করে, সেগুলি দার আস-সালাম (ইসলামের ভূমি), যে সমস্ত দেশে মুসলমান ব্যতীত অন্য কেউ ক্ষমতায়, সেই দেশগুলি দার আল-কুফর (অবিশ্বাসের ভূমি)। এই মানসিকতার কারণেই বহু মুসলমান মনে করেন যে এই সম্ভাব্য অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যে কোনো রকম জঘন্য কর্ম শাস্তিরূপে সম্পাদন করা যেতে পারে। বর্তমান কালের মুসলমানদের এই নেতিবাচক মানসিকতার কারণে এক শ্রেণীর উলেমা বা মুসলমান পন্ডিতরা আত্মঘাতী বোমাহানাকে বৈধ ঘোষণা করার প্রয়াস পেয়েছেন—একটি কর্ম যা সর্বদাই অবৈধ বলে সাধারণভাবে গৃহীত ছিল।

উপরন্তু, কোনো কোনো মুসলমান পণ্ডিত (আলিম) প্রকাশ্য ফতোয়া জারি করে আত্মহত্যাকে বৈধ ঘোষণা করেছেন। তাঁরা আত্মঘাতী বোমাহানাকে বৈধতা প্রদান করতে গিয়ে একটি নতুন শব্দ, 'ইশতিশ্হাদ' (শহিদ হওয়ার বাসনা) সৃষ্টি করেছেন।

নিঃসন্দেহ এই সমস্ত ফতোয়া ভুল। এবং এটি আশ্চর্যজনক যে ধর্মীয় পরিমন্ডলের সমগ্র উলেমা সম্প্রদায় খোলাখুলিভাবে এই ফতোয়ার নিন্দা করতে এগিয়ে আসেনি।

আত্মঘাতী বোমাহানা বা হারা কিরি সর্বপ্রথম বৃহৎ আকারে জাপান শুরু করেছিল। ঐতিহ্যগতভাবে ঐ দেশে হারা কিরি ছিল প্রথাসিদ্ধ আত্মহননের পদ্ধতি যাতে আত্মহননকারী নিজের পেট চিরে ফেলত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের এই হারা কিরি পদ্ধতি সম্পূর্ণ অকার্যকর প্রতিষ্ঠিত হল, এবং ক্রমে এটি ত্যাগ করা হয়।

মুসলমান উগ্রপন্থীদের এই আত্মঘাতী বোমাহানার পদ্ধতিও সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়েছে। এই সমস্ত আক্রমণের দ্বারা তারা নিরপরাধ প্রাণগুলি হত্যা করে, কিন্তু কোনো ইতিবাচক ফল হয় না। তাহলে প্রশ্ন জাগে, কি করে এই আত্মঘাতী বোমাহানার মারণ পদ্ধতি এখনও জারি আছে।

তার কারণ এই যে মুসলমানরা নিজেদের মতো করে একটি ভিত্তিহীন বিশ্বাস গড়ে তুলেছে যে, কোনো ব্যক্তি যুদ্ধে মারা গেলে শহীদ হয় এবং তারপর সে সোজা স্বর্গে প্রবেশ করে। এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ মিথ্যা।

ইসলামি শিক্ষা অনুসারে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আত্মঘাতী বোমাহানায় যে মুসলমানরা মারা যায়, তাদের মৃত্যু বিধিসঙ্গত নয়। তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য কোনো স্বর্গ অপেক্ষা করে নেই।

ইসলাম বিশ্বাস করে যে মুসলিম বিশ্বসহ সমগ্র পৃথিবী *দার আল ইনসান* (মানবতার বাসভূমি)। এটি মুসলমানদের বাধ্যতামূলক কর্তব্য যে তারা সমস্ত মানুষকে ঈশ্বরের

সৃষ্টি বলে সম্মান করবে। একবার মদিনায়, এক ইহুদির শবযাত্রা দেখে হজরত মহম্মদ সসম্মানে উঠে দাঁড়ান। যখন তার এক অনুচর এ বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করেন, হজরত উত্তর দেন : উনি (মৃত ব্যক্তিটি) কি মানুষ ছিলেন না?[৩]

অর্থাৎ, হজরত মহম্মদ তার নিজের সঙ্গে একজন ইহুদির কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন, যে ঈশ্বর তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন, সেই ঈশ্বরই ইহুদী মানুষটিরও স্রষ্টা। এটিই মানব সমতার প্রকৃত ভিত্তি।

আজ যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ শিল্প পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ উদ্যোগ। প্রশ্ন এই যে, যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ শিল্পকে এত রমরমা ব্যবসায় কে পরিণত করল? স্পষ্টত এই কাজ যুদ্ধাস্ত্র ক্রেতারা করেছেন। এই ক্রেতারাও ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং ঈশ্বর তাদের মন দিয়েছিলেন যাতে তারা সেটি স্বাস্থ্যকর কাজে ব্যবহার করতে পারে।কিন্তু তারা সেটি ধ্বংসাত্মক লক্ষ্যে ব্যবহার করেছে; তা ঈশ্বরের ইচ্ছার পরিপন্থী। ঈশ্বর তাদের প্রশ্ন করবেন তারা কিভাবে তাদের মন ব্যবহার করেছে - গঠনমূলক উদ্দেশ্যে নাকি ধ্বংসাত্মক লক্ষ্যে? স্রষ্টা তাদের মনে করিয়ে দেবেন যে তিনি তাদের প্রত্যেককে একটি করে মহামূল্যবান মন দিয়েছিলেন সৃজনশীল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য, কিন্তু তারা সেটি ধ্বংসাত্মক লক্ষ্যে ব্যবহার কচ্ছে। তাদের কাছে কি এই প্রশ্নের কোনো উত্তর থাকবে?

দৃষ্টিকোণের উপরেই সমস্ত নির্ভর করে

ইংরেজ কবি এবং ধর্মীয় লেখক ফ্রেডরিক ল্যাংব্রিজ (১৮৪৯-১৯২৩), তাঁর একটি কবিতায় লিখেছিলেন:

'দুজন মানুষ তাকিয়েছিল কারাগারের বাইরে',

একজন শুধু কাদা দেখতে পেয়েছিল, অন্যজন তারা দেখেছিল।' [১]

যে কোন ঘটনাকেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সম্ভব। একজনের কী মতামত তৈরী হবে তা নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। একটি নির্দিষ্ট কোণ থেকে যে কোনো বিষয় দেখলে মানুষ অস্ত্যর্থক আশাবাদী হয়ে ওঠে,অন্য অবস্থান থেকে দেখলে সেই মানুষটিই নেতিবাচক হয়ে উঠতে পারেন।

এই বিষয়টি আমেরিকার ৯/১১-র ঘটনা দিয়ে বোঝা যেতে পারে। মুসলমানদের একটি অংশ, যারা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে আমেরিকাকে দেখত যে আমেরিকা ইসলামের শত্রু, তারা আমেরিকার মাটিতে আত্মঘাতী হানার মাধ্যমে সেই দেশটিকে একটি শিক্ষা দিতে চেয়েছিল। ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ সালে একদল সন্ত্রাসী চারটি যাত্রীবিমান ছিনতাই করে; এর মধ্যে দুটি বিমান নিউ ইয়র্ক শহরের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উত্তর ও দক্ষিণের টাওয়ার দুটিতে আছড়ে পড়ে।

১১০ তলা বিশিষ্ট টাওয়ার দুটি ভেঙ্গে পড়ে, প্রবল অগ্নিকাণ্ডের সূচনা হয় এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার চত্বরের অন্যান্য ভবনগুলি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আক্রমণের কিছুকাল পরে, ১২ই অক্টোবর, ২০০২ সালে সুইজারল্যাণ্ডের জুগ শহরে আমি পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ মঞ্চের একটি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম। এই উপলক্ষ্যে আমি যে বক্তৃতা দিই, তাতে আমি প্রসঙ্গক্রমে ১১ই সেপ্টেম্বরের ভয়ংকর আক্রমণের কথা উত্থাপন করি এবং এ বিষয়ে কথা বলতে শুরু করার পর, আমি কাঁদতে থাকি।

ঘটনার দিনে নতুন দিল্লিতে বসে আমি, যখন রেডিওয় প্রথমবার এই আক্রমণের কথা শুনি, আমি তখনও কেঁদেছিলাম।

আমি কেঁদেছিলাম কারণ আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে এই সহিংস কর্ম সম্পাদনের সঙ্গে যারা যুক্ত, তারা সম্পূর্ণ নির্বোধ। তারা এই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছে। যদি তারা ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে পুরো ব্যাপারটি দেখত, তাহলে তারা একটি বিরাট শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত।

১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি নিউ ইয়র্কে গিয়েছি লাম। এই যাত্রাপর্বে আমি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে যাই এবং একদম উপর পর্যন্ত চড়েছিলাম। সন্ত্রাসবাদীরা যেখানে টাওয়ারগুলিকে খুবই নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিল, আমি একটি সদর্থক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ভবনগুলিকে দেখি এবং আমারও খুবই বড় একটি উপলব্ধি হয়। আমি চিন্তা করি যে আধুনিক প্রযুক্তি প্রকৃতির একটি বিশাল উপহার।সেটি মানুষের জন্য অনেক নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। যদি আনুভূমিক বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট জমি না থাকে, তাহলে সর্বদাই উল্লম্ব বৃদ্ধির সুযোগ নেওয়া যেতে পারে।

আধুনিক সভ্যতার আগমনের অনেক আগে, সপ্তম শতকে কোরানের বাণী এসেছিল। সেই সময় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোরানে এক ঐতিহাসিক পূর্বাভাস পাওয়া যায়:

'আমরা তাদের মহাবিশ্বে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে আমাদের চিহ্নগুলি দেখাব, যতক্ষণ না তাদের কাছে পরিষ্কার হয় যে এটিই সত্য' (৪১ঃ৫৩)।

এর অর্থ এই যে কোরানের ঐশী বাণী প্রেরিত হওয়ার পরে, মানুষের ইতিহাসে একটি বৈপ্লবিক পর্বের সূচনা হবে। বিংশ শতাব্দী এই উন্নতিপর্বের শীর্ষবিন্দু।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের এই জোড়া টাওয়ার দুটি, ইতিহাসে নতুন অগ্রগতির একটি প্রতীকী প্রতিচ্ছবি, আসলে সম্পূর্ণ নতুন একটি যুগের সূচক ছিল। আগেকার সময়ে কেলমাত্র আনুভূমিক উন্নতি সম্ভব ছিল। কিন্তু এখন, প্রযুক্তির উন্নতির কারণে, সীমাহীন উল্লম্ব উন্নতি এখন বাস্তব। এই টাওয়ার দুটি সেই অর্থে মানবতার প্রতি ঈশ্বরের অনন্য আশীর্বাদের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, যেহেতু কিছু মুসলমান ভুলক্রমে ভেবেছিল যে এটি তাদের তথাকথিত শত্রুর প্রতীক, অভূতপূর্ব ধ্বংসের মাত্রাসহ অস্বাভাবিক বায়ু হানার দ্বারা তারা এটি আক্রমণ করে।

উপরে উদ্ধৃত কোরানের ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী বর্তমানকালে বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। যেমন, প্রাচীনকালে ঈশ্বরের সৃষ্টির মহিমা খালিচোখে ক্ষীণভাবে দৃশ্যমান হত; টেলিস্কোপ এবং মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের ফলে আজ অনেক বিশদে, অনেকখানি গভীরভাবে তা উপলব্ধি করা যায়। আমরা পূর্ববর্তী যুগগুলিতে দাওয়াহ্‌কর্ম

বা ঈশ্বরের বার্তা প্রচার স্থানীয় স্তরে খুব সীমিতমাত্রায় করতে পারতাম। আজকের দিনে ছাপাইকর্ম এবং বৈদ্যুতিন যোগাযোগের উন্নতির ফলে বিশ্বায়িত স্তরে দাওয়াহ্কর্ম করা সম্ভব। তেমনই, আগের যুগে যাত্রাকালে, পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র এড়ানো যায়না এমন অনেক প্রতিকূলতার জন্য যাত্রা ব্যাহত হত।

আজকের যুগে আমরা বিমানের সাহায্যে এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে উড়ে যেতে পারি। আমাদের যাত্রা দ্রুততর এবং সুবিধাজনক হয়ে উঠেছে।

রাজতন্ত্রের কালে, একজন সাধারণ মানুষের সামনে খুব কম সুযোগ থাকত। কিন্তু আজ গণতন্ত্র এসে শাসকের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে চূড়ান্ত সীমাবদ্ধ করেছে। এই প্রক্রিয়ার ফলে সকলের জন্য বহুক্ষেত্রে বহু সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। সেইরকম, পূর্ববর্তীকালে ধর্মীয় নির্যাতন প্রচলিত ছিল, আজ সমস্ত মানুষ সীমাহীন ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে।

আধুনিক যুগে এই সমস্ত পরিবর্তন হিংসাকে একেবারেই অর্থহীন করে তুলেছে। বর্তমানযুগের উন্নতির ফলে আজ শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সমস্ত কিছু অর্জন করা যায়, যা আগে কেবলমাত্র সহিংস পদ্ধতিতে অর্জন করা সম্ভব হত। পূর্বে সমস্ত বিস্তারের ফলে সংঘর্ষের সৃষ্টি হত, কারণ এর মধ্যে অন্যের এলাকায় ঢুকে পড়ার বিষয়টি অনিবার্য ছিল, কিন্তু এখন উন্নতির এমন কিছু নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে, যার ফলে বিন্দুমাত্র সংঘর্ষে না গিয়েও প্রবল বিস্তার সম্ভব।

একথা সত্য যে মানুষ স্বভাবত উচ্চাকাঙ্ক্ষী। আগে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য মানুষ গোষ্ঠীগুলিকে পরাজিত করতে বা একের পর এক যুদ্ধের দ্বারা অধিক পরিমাণ জমি দখল করার চেষ্টা করত। কিন্তু এখন অবশ্য এই দুটির কোনোটাই করার প্রয়োজন হয়না। আজ প্রযুক্তি এই সমস্ত কাজের বিকল্প হয়ে উঠেছে, যেহেতু হিংসা ও সংঘর্ষ ছাড়াই সমস্ত ধরনের উন্নয়ন ও প্রগতি কর্ম করা সম্ভব। আধুনিক প্রযুক্তি অবশ্যই শান্তির দরজা খুলে দিয়েছে।

আধুনিক যুগ প্রযুক্তির যুগ। যারা এই যুগেও যুদ্ধ করে, তারা প্রমাণ করে যে তারা নতুন যুগের সম্ভাবনাগুলি সম্পর্কে একেবারেই অবহিত নয়। তারা শান্তির যুগে বাস করে, কিন্তু তাদের মানসিকতায় যুদ্ধের সেকেলে বাতিল হয়ে যাওয়া ভাবনার ছাপ রয়ে গিয়েছে।

ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক যুগ ছিল ষোড়শ থেকে বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। উপনিবেশিকতার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশবাদী দেশগুলির উৎপাদিত

দ্রব্যসমূহের জন্য বিশ্বজুড়ে একটি বাজার তৈরী করা। সেই সময় কেবলমাত্র দেশটির উপরে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারলে এটি সম্ভবপর হত। ফলে উপনিবেশবাদ আসলে 'রাজনৈতিক উপনিবেশবাদ'-এ পর্যবসিত হল। বর্তমান যুগে শিল্পায়িত রাষ্ট্রগুলি কোনো সামরিক বা রাজনৈতিক সংঘর্ষ ছাড়াই আরো বড় মাত্রায় একই ভূমিকা পালন করছে। এই পরিবর্তন আধুনিক প্রযুক্তির কারণে সম্ভব হয়েছে।

যে মুসলমানরা রাজনৈতিক লক্ষ অর্জনের উদ্দেশ্যে লড়াই করছে তারা সম্ভবত জানে না যে আধুনিক প্রযুক্তির সম্পদসমূহ ব্যবহার করে তারা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের সমস্ত লক্ষ অর্জন করতে পারে ।

সহিংস পদ্ধতি কেবলমাত্র জীবন ও সম্পত্তির বিনাশ ঘটাতে পারে।

একটি নতুন যুগে বাস করা

বর্তমানযুগে মুসলমান সম্প্রদায় যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার একটাই কারণ, যে তারা বর্তমান যুগের সুযোগসুবিধা সম্পর্কে অবহিত নয়।

আধুনিক যুগ, সর্ব অর্থে একটি নতুন যুগ। পূর্ববর্তী যুগটি যদি ঐতিহ্যিক বলে ধরা হয়, আধুনিক যুগ অনৈতিহ্যিক। কিন্তু বর্তমান যুগের মুসলমানরা বিষয়টি সম্পর্কে একেবারেই অবগত নয়। সেইকারণেই ঐতিহ্যিক ধারায় তাদের সমস্ত পরিকল্পনা নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে। অন্যভাবে দেখলে, বর্তমানকালের মুসলমানরা এক ধরনের কাল-অসঙ্গতির শিকার, অর্থাৎ বর্তমান যুগে বাস করেও তারা পুরানো যুগের বাতিল হয়ে যাওয়া মানসিকতাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

মুসলমানদের পুনরুজ্জীবনের যে কোনো প্রয়াস সফল হতে পারে একমাত্র যদি তাদের চিন্তাধারায় কোনো পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। তা যেন তাদের অতীত থেকে বেরিয়ে এসে বর্তমানে বাস করতে সাহায্য করে।

১৯১১-১২র তুর্কী-ইতালীয় যুদ্ধের সময় লিবিয়ার সৈনিকরা এই বিখ্যাত স্লোগানটি তুলেছিলেন:

মুতু আল-ইয়ম্-আইজ্জা কাবলা আল তামুতু গাদান আজিল্লা (আজ একটি শ্রদ্ধা সম্ভব মৃত্যু বরণ কর, না হলে আগামীকাল অসম্মানের মৃত্যু বরণ করতে হতে পারে)।

যে পতাকায় এই স্লোগান লেখা ছিল সেটি আমি সচক্ষে দেখেছি এবং আজও ত্রিপোলির যাদুঘরে সেটি সংরক্ষিত আছে। বর্তমানকালের মুসলমানরা কী ভাবেন তা হয়ত এ স্লোগানের মধ্য দিয়ে যথার্থ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু এটি ঈশ্বরের সৃষ্টি পরিকল্পনার বিরোধী। যথার্থ স্লোগান হওয়া উচিত, 'জীবন ঈশ্বরের দেওয়া একটি অমূল্য উপহার। সৃজনশীল উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার করা উচিত।'

প্রত্যেক মানুষের কিছু অনন্য গুণ আছে, এটি স্রষ্টার সৃষ্টি পরিকল্পনার বিরুদ্ধ যে কোনো ব্যক্তি কেবল যুদ্ধ করে নিজের মৃত্যুর কারণ হবে। প্রত্যেক মানুষের

উচিত বেঁচে থেকে নিজের ক্ষমতার স্বাস্থ্যকর ব্যবহার করা। যাঁরা যুদ্ধ করে মারা গিয়েছেন, পৃথিবীর সমস্ত উন্নতি তাদের দ্বারা সাধিত হয়নি; সেই উন্নতি তাদের দ্বারা অর্জিত হয়েছে, যারা স্রষ্টার থেকে পাওয়া জীবনের সুন্দর প্রয়োগ করেছেন। যদি পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যুদ্ধ বিগ্রহে মত্ত থাকত, তাহলে মানবজীবনের কোনো অগ্রগতি হতো না। আজ উগ্রপন্থীরা আধুনিক দিনের যেসমস্ত সম্পদ ব্যবহার করে, সেগুলিও সৃষ্টি হত না।

এমনকি আজ পর্যন্ত অসংখ্য মুসলমান, লিবিয়ার যোদ্ধারা যে ধরনের চিন্তা ভাবনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন, তার দ্বারা প্রভাবিত। বর্তমানকালের মুসলমানদের সহিংস চিন্তন এই ধরনের মানসিকতা থেকে শুরু হয়। যে মুসলমান গোষ্ঠীগুলি সন্ত্রাস প্রচার করে, তারা খুব ভালো করেই জানে অপর পক্ষ এতটাই শক্তিশালী যে তারা তাদের উপর কোনো গুরত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারবে না। তবু তারা হিংসা-সন্ত্রাস চালিয়ে যেতে থাকে। সহিংসতার পিছনে এই প্ররোচনা কাজ করে, মুসলমানরা ভ্রান্তভাবে বিশ্বাস করেন যে যদি তাঁরা জিহাদের নামে হিংসায় জড়ান এবং সেই প্রক্রিয়ায় তাঁদের শত্রুদের হাতে নিহত হন, তাহলে তাঁরা শহীদ হয়ে সরাসরি স্বর্গে পৌঁছে যাবেন।

এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মুসলমানদের হত্যা করতে উদগ্রীব নয়। মুসলমানরা এই তত্ত্ব তৈরী করেছেন যে তাঁদের ক্ষতি করার জন্য বা হত্যা করার জন্য একটি প্রচণ্ড ষড়যন্ত্র চলছে। এই ভিত্তিহীন এবং অস্বাভাবিক ভীতির কারণে তাঁরা সহিংসতায় জড়িয়ে পড়েন, যার ফলে তাঁদের অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। এই সমস্ত ঘটনাগুলি মুসলমানদের আক্রমণের উদাহরণ, যে কারণে অন্যরা প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়।

সিরিয়া দেশের সুপরিচিত কবি খায়রুদ্দিন আল-জিরিক্লি (মৃত্যু ১৯৭৬) অতীতের খ্যাতনামা মুসলমান ব্যক্তিত্বদের নিয়ে ‘আল-আলম’ নামক বহু খণ্ড বিশিষ্ট একটি বিশাল সমগ্র রচনা করেন। তিনি কল্পনা করেছিলেন যে যদি তেমন মহামানবরা আবার জন্মগ্রহণ করেন, তাহলে মুসলমানরা একটি নবজাগরণের অভিজ্ঞতা পেতে পারেন। তাঁর একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন :

হাতি সালাহাদ্দিন থানিয়াতন ফিনা

জাদ্দিদি হিত্তিন অউ শিভ হিত্তিনা

(আমাদের মধ্যে সালাহ্দিনকে ফিরিয়ে আনো
হাত্তিনের যুদ্ধের বা অনুরূপ জীবনীশক্তিসম্পন্ন যুদ্ধগুলির পুনঃপ্রবর্তন ঘটুক)।

আল জিরিক্‌লির এই পংক্তি দুটি আজকের মুসলমানদের সাধারণ চিন্তনের প্রতিফলন। মুসলমান সাহিত্যে সালাহ্‌উদ্দিন আইয়ুবি এবং মুসলমান ইতিহাসের প্রথমদিকের সেনানায়কদের বিজয়কাহিনি এবং কৃতিত্বসমূহ সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর ফলে বহু মুসলমান মনে করেন যে সালাহ্‌উদ্দিনের মতো আবার কেউ জন্মগ্রহণ করলে তিনি তাদের গৌরবপূর্ণ বিজয় এনে দিতে পারবেন, যেমনটি দ্বাদশ শতকে সম্ভব হয়েছিল। এই ধরণের চিন্তন আসলে বর্তমান সময় সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব থেকে ঘটে। মুসলমানরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত যে দ্বাদশ শতাব্দীতে সলাহ্‌উদ্দিনের বিজয়ের মত কোনো ঘটনা আজ অসম্ভব। বর্তমান সময়ে মুসলমানদের মধ্যে সালাহ্‌উদ্দিনের মত অনেক নেতার জন্ম হয়েছে- যেমন ইয়াসের আরাফাত, সৈয়দ কুতুব এবং অন্যান্য মুজাহিদ নেতা, কিন্তু মুসলমান বিষয়গুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁরা কিছুই করতে পারেননি। সালাহ্‌উদ্দিনের প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুলতা বর্তমান যুগের বাস্তব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন থাকার ফল। মুসলমানদের মনে রাখতে হবে যে বর্তমান যুগে, ক্ষমতা এবং শক্তি যুদ্ধের দ্বারা নির্ধারিত হয় না, তা নির্ধারিত হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অগ্রগতির মাধ্যমে। এই যুগে এবং আজকের দিনে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে প্রোৎসাহিত করা সাফল্যের শ্রেষ্ঠ উপায়। অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানরা তাঁদের পরিকল্পনায় যুগের বাধ্যবাধকতাগুলি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন— সেখানেই তাদের প্রচেষ্টাগুলি পথ হারিয়েছে।

তরুণরা কেন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীতে যোগ দিচ্ছে?

বর্তমান সময়ে মুসলমান তরুণরা বিশাল সংখ্যায় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিতে যোগ দিচ্ছে। এই প্রপঞ্চটি ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এর একটা ব্যাখ্যার চেষ্টা করা যেতে পারে।

সত্য এই যে যৌবনে মানুষ উৎসাহে ভরপুর থাকে। তারা বৈপ্লবিক কিছু করতে চায় এবং একটি মহান লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে চায়। এই বাসনা পূরণের উদ্দেশ্যে আমি এবং আমার সহকর্মীরা একটি কার্যকরী পদ্ধতি গ্রহণ করেছি।

ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে যোগদানের জন্য মানুষের উৎসাহ অনুধাবন করে আমরা একটি প্রকল্প পরিকল্পনা করেছি যার ব্যাপ্তি বিশ্বময় এবং একই সঙ্গে, যা সম্পূর্ণ শান্তি অভিমুখী। এই প্রকল্পের প্রধান কাজ বিশ্বের সমস্ত দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত কোরান এবং আনুষঙ্গিক সাহিত্যের বিতরণ।

এই প্রকল্পকে রূপায়িত করতে আমরা বিশ্বের সমস্ত প্রধান ভাষায় কোরান অনুবাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বর্তমানে আমরা দশটি ভাষায় এই অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরেছি। আমরা যখন এই প্রকল্পটি শুরু করি, তখন বহু তরুণ, মুসলমান এবং অমুসলমান উভয়ই, সোৎসাহে এই প্রকল্পে যোগদান করে। বিভিন্ন স্থানে লোকেদের কাছে কোরানের এই অনুবাদগুলি পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে তারা নিজেরাই বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে।

যেহেতু, যে কোনো কারণেই হোক, আজকাল কোরান বিষয়ে বিভিন্ন কথা উঠে আসছে, বিভিন্ন জায়গায় মানুষরা স্বতস্ফূর্তভাবে নিজেদের ভাষায় অনূদিত কোরান গ্রহণ করেন। এই আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়ার কারণে আমাদের প্রকল্পের সদস্যরা আরো উৎসাহিত বোধ করে।

ফোরাম ফর প্রোমেটিং পিস ইন মুসলিম সোসাইটিজ (মুসলমান সমাজগুলিতে শান্তি প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত মঞ্চ) -এর উদ্যোগে এপ্রিল ২৮-৩০,২০১৫ তারিখে আবু ধাবিতে আয়েজিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমি বক্তব্য রেখেছিলাম।

সেখানে আমি বলেছিলাম যে যদি আমরা মুসলমান তরুণদের মনে পরিবর্তন আনতে চাই, তাদের সামনে একটি শান্তিপূর্ণ বিকল্প রাখতে হবে। শ্রেষ্ঠ বিকল্প হচ্ছে বিশ্বজুড়ে কোরান বিতরণ করা।

ইসলামের পয়গম্বর হজরত মহম্মদ স্বয়ং সপ্তম শতকে মুসলমানদের জন্য একটি আদর্শ নির্দিষ্ট করে দেন। একটি ধারা অনুসারে, তিনি বলেছিলেন যে ভবিষ্যতে **ঈশ্বরের বাণী বিশ্বের প্রতিটি গৃহকোণে, প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে।**[১] সেই সময় তাঁর এই উক্তি একটি ভবিষ্যদ্বাণী ব্যতীত আর কিছু ছিল না। কিন্তু আজ আধুনিক প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এই ভবিষ্যদ্বাণী চূড়ান্তভাবে সফল হয়ে উঠেছে। উপরন্তু, বর্তমান সময়ে প্রতিদিন ‘ইসলামিক সহিংসতা’র সংবাদ বিশ্বের গণমাধ্যমগুলিতে স্থান করে নিচ্ছে।

এই অবস্থার কারণে কোরান নিত্য আলোচনার একটি বিষয় হয়ে উঠেছে এবং কোরানের বাণী সম্পর্কে মানুষের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ এগুলি পড়ার বিষয়ে আগ্রহী। আজকের মুসলমান তরুণদের আমরা এই দায়িত্ব দিতে পারি যাতে তারা উৎসুক মানুষদের কাছে কোরানের বার্তা পৌঁছে দেয়। আজ তরুণ মুসলমানদের জেগে উঠে বিশ্ব জুড়ে কোরানের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। এই প্রকল্পটি মুসলমান তরুণদের সন্ত্রাসবাদ অপেক্ষা লক্ষকোটি গুণ আকর্ষণীয়। একমাত্র সমস্যা এই যে মুসলমান তরণরা এই প্রকল্প বিষয়ে অবহিত নন। এই তরুণরা যে ভাষা বোঝে, সেই ভাষায় যদি তাদের কাছে এই কাজের গুরত্ব বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তারা নিশ্চয় সহিংস পথ ত্যাগ করে কোরানের বিশ্বব্যাপী প্রচারের কর্মকাণ্ডে যোগ দেবে।

সাম্প্রতিক কালে সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে, যার সিদ্ধান্তগুলি বর্তমান বিষয়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক। কলম্বিয়া বিশ্ববিদালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডি পি ফর্টনা তাঁর সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক গবেষণা পত্রে মন্তব্য করেন: ‘অপর পক্ষকে যন্ত্রণা দানের জন্য সন্ত্রাস একটি সস্তা উপায়।’ [২]

বর্তমানের সন্ত্রাসবাদী সংস্কৃতি দীর্ঘকাল ক্রোধ পুষে রাখার একটি ফল। সন্ত্রাসবাদীরা তাদের ভিতরে জমে থাকা নেতিবাচক বোমাগুলি তাদের শত্রুদের দিকে ছোঁড়া ছাড়া আর কী করছে? তাদের কাছে এটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যে তাদের কাছে আরো শক্তিশালী একটি অস্ত্র আছে। সেটি হল কোরান, একটি ইতিবাচক বোমা, যা তাদের কাছে থাকা সহিংস বোমাগুলির থেকে লক্ষকোটি গুণ কার্যকরী । এই ব্যাখ্যা নিশ্চয় ঐ তরুণদের সহিংসতার পথ থেকে শান্তির পথে আসতে সাহায্য করবে।

উপরের এই বাস্তব আসলে ইতিহাসের অভিজ্ঞতা। ইসলামের প্রথমদিকে, আরব মানুষরা সংস্কৃতিগতভাবে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ছিল। তারা তরবারির সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল, প্রতিপক্ষের দিকে তাদের অস্ত্র সর্বদাই উদ্যত থাকত। এই সময় তাদের কাছে কোরান প্রেরণ করা হয় যা তাদের জন্য একটি ইতিবাচক বিকল্প প্রমাণিত হয়। কোরানের আদর্শ আরবদের '(শান্তি পূর্ণ) নায়কদের (শান্তিময়) শিশুশালা'[৩]-র মতো হয়ে ওঠে। প্রথম যুগের এই মুসলমানরা কোরান হাতে আরবদেশের প্রান্তর ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বে কোরানের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ স্যার আর্থার কীথ, *আ নিউ থিয়োরি অব ইভোলিউশন* (বিবর্তনের একটি নতুন তত্ত্ব) নামে ১৯৪৮ সালে একটি বই লেখেন। সেখানে তিনি মিশরের প্রাচীন ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, খিলাফত যুগে সেদেশে ইসলামের প্রসার বিষয়ে মন্তব্য করেন। তিনি বলেছিলেন 'মিশরীয়রা তরবারির দ্বারা বিজিত হয়নি, কোরানের সাহায্যে তাদের জয় করা হয়েছিল।' [৪]

যদি তাদের উপলব্ধি করানো যায় যে কোরান তাদের জন্য একটি বিকল্প হতে পারে, আজকের তরুণদের হাতে একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটা সম্ভব। তখন পৃথিবী দেখতে পারে যে অতীতের সহিংসতায় তৎপর তরুণরা কিভাবে বর্তমানের শান্তিপ্রিয় নায়ক হয়ে উঠেছে।

শিক্ষার মাধ্যমে শান্তি

রুশ ঔপন্যাসিক লিও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০)-কে সর্বকালের অন্যতম লেখক বলে মনে করা হয়। তিনি ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত ‘উইজডম অব চিলড্রেন’ (শিশুদের বুদ্ধিমত্তা) নামে একটি ছোটো গল্প লিখেছিলেন। এই গল্পে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে টলস্টয় লেখেন যে তিনি কিছু শিশুকে একত্রে খেলতে দেখেছিলেন। সে খেলার তাৎপর্য ছিল এই যে তারা প্রায়শই উত্তপ্ত বিনিময়ে জড়িয়ে পড়ছিল, কিন্তু তাদের ঝগড়া থেকে কোনো ঘৃণা এবং প্রচন্ড সংঘর্ষের সৃষ্টি হচ্ছিল না। অতি সত্বর তারা আবার আগের মত খেলা শুরু করছিল।

টলস্টয় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে এটিই শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য প্রকৃতির আদর্শ। মানুষের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটতেই পারে, কিন্তু মৌখিক বিনিময়ের বেশী কখনই এগোনো উচিৎ নয়। পার্থক্যের কারণে ঘৃণা, সহিংসতা এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ কখনই কাম্য নয়। প্রকৃতির এই আদর্শই টলস্টয়ের উপন্যাসের ভিত্তি।

একথা সত্য, যে শিশুদের জীবনে আমরা যা দেখি, তাই প্রকৃতির আদর্শ। শিশুরা তাদের গঠনমূলক বয়সে থাকে, অতএব তাদের অহমিকা গড়ে ওঠে না। তারা জীবনের প্রাক-অহমিকা পর্বে থাকে। কিন্তু এই শিশুরাই যখন বড় হয়ে সমাজের অংশ হয়ে ওঠে, তারা এরকম আচরণ করে না। পৃথিবীর সমস্ত সমস্যা এই বড় হয়ে যাওয়া শিশুদের নিয়ে। যখন তারা বড় হয়ে যায়, এই শিশুরাই অহমিকাপূর্ণ হয়ে ওঠে। যদি তাই হয়, অহমিকাহীনের আদর্শ কীভাবে অহমিকাপূর্ণ মানুষের জন্য প্রযোজ্য হবে? শৈশবে মানুষ তার অন্তরের প্রকৃতি দ্বারা পরিচালিত হয়।

কিন্তু যখন তারা ক্রমে বড় হয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তারা তাদের সচেতন মন দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। এখন তাদের অন্তরের প্রকৃতির ভূমিকা সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে। এই পর্বে যা প্রয়োজন তা হল পরিণতবয়স্কদের চিন্তন এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে তারা শৈশবের সেই বৈশিষ্ট্য অনুসারে তা ব্যবহার করতে পারে—কিন্তু সচেতনভাবে, এবং ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার করে।

টলস্টয় এবং অন্যান্যরা বহু কল্পকাহিনী রচনা করেছেন। কিন্তু কল্পকাহিনী কেবল বিনোদনের উৎস হতে পারে, তা মানব মনের সচেতন প্রশিক্ষণের উপকরণ হতে পারে না। পাঠকের সচেতন প্রশিক্ষণের জন্যে এমন বই লেখা প্রয়োজন যা তাদের যুক্তি এবং কার্যকারণ বোধকে উদ্দেশ্য করে কথা বলবে। অর্থাৎ, এই সমস্ত বইয়ের ভিত্তি হতে হবে ঐতিহাসিক তথ্য, তাতে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের উল্লেখ থাকবে এবং তাকে বাস্তব জীবনের, কল্পকাহিনীর বাইরে বাস্তব ব্যক্তিত্বসমূহের উদাহরণ দিতে হবে।

কল্পকাহিনী মানুষের আনন্দবোধকে বাড়িয়ে তোলে, সর্বদা যুক্তির কথা বলে না। সেই কারণে আমরা যখন কল্পকাহিনীর মাধ্যমে কিছু বলার চেষ্টা করি, তার কোনো ফল হয় না; ব্যক্তির জীবনে কোনো যথার্থ পরিবর্তন আনতে তা ব্যর্থ হয়।

মানুষের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা যুক্তিপূর্ণভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা। বলা হয়, মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী। কল্পকাহিনী পাঠ বিনোদনের উৎস হতে পারে, কিন্তু আমরা যদি কোনো ব্যক্তির জীবনে বিপ্লব আনতে চাই, তাহলে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান এবং যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমাদের তথ্য পরিবেশন করতে হবে। কোনো ব্যক্তির চিন্তনে বিপ্লব সূচিত করার এটিই একমাত্র উপায়। বৌদ্ধিক বিপ্লবের কম কোনো কিছুর দ্বারা মানব জীবনে যথার্থ উপকারী পরিবর্তন আসতে পারে না।

একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য মনের পুনঃ-প্রকৌশলায়ন প্রয়োজন। সেই কাজটি একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব, প্রথাগত শিক্ষার থেকে অপ্রথাগত শিক্ষার দ্বারা তা অনেক বেশী সম্ভব। অপ্রথাগত শিক্ষা অর্থে, আমি বলি গণমাধ্যম, সাহিত্য, সভাসমিতি, ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা।

এখানে আমি শান্তি বিষয়ে কেবল তত্ত্ব আলোচনা করছি না; আমি এ বিষয়ে বাস্তবে পরীক্ষাও করেছি। এই পরীক্ষার ক্ষেত্র ছিল কাশ্মীর। আমি ১৯৬৮ সাল থেকে কাশ্মীরিদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ চিন্তন প্রসার বিষয়ে কাজ করছি, এবং এখনও তা করে চলেছি। এই আন্দোলনের ফলে এক বিশাল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে এবং এখন কাশ্মীরের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে আমাদের মিশনের শান্তি প্রচার প্রকল্পের সাহিত্য পাঠ করা হয়।

যে সমস্ত কাশ্মীরিরা আমাদের ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে পরিচিত, তাঁদের সঙ্গে নিয়ে আমরা ২০১১ সালে একটি সভার আয়োজন করি। এই উপলক্ষে একটি কথোপকথনে একটি কাশ্মীরি গোষ্ঠীর প্রতিনিধি জানান "অক্টোবর ১৯৮৯ থেকে অক্টোবর ২০১১ পর্যন্ত আমরা একটি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছি। আগে আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর দিকে পাথর ছুঁড়তাম। এখন আমরা তাদের শান্তিবিষয়ক সাহিত্য উপহার দিয়ে থাকি।"

১৯৪৭ সালের পর থেকে যে কাশ্মীর ক্রমাগত সশস্ত্র সংগ্রামে রত ছিল, সেই কাশ্মীর এখন এক শান্তিপূর্ণ রাজ্যে পরিণত হয়েছে। কাশ্মীর থেকে যে সহিংসতা ও আক্রমণের খবর আসে, তা স্থানীয় কাশ্মীরিদের কাজ নয়—তা বাইরে থেকে পরিচালিত প্রক্সি যুদ্ধের ফল।

উপরের এই 'শিক্ষার মাধ্যমে শান্তি' -এর উদাহরণের অভিজ্ঞতা সর্বত্র দেখা যায়। শান্তি নিয়ে আসার সবথেকে কার্যকরী উপায় একটিই— এবং সেটি হল শান্তিপূর্ণ ধারায় মানুষের মনগুলিকে শিক্ষিত করে তোলা।

সমাজে পরিবর্তন আনবার শ্রেষ্ঠ উপায় শিক্ষা। ছাপাখানা আবিষ্কারের আগের যুগে বই পাওয়া যেত না। সেই কারণে বৃহৎ আকারে জনগণকে শিক্ষিত করা সম্ভব ছিল না। যুদ্ধ সেই প্রাচীন যুগের ধারা বহন করে চলেছে। সেই সময় মানুষ বলপূর্বক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করত এবং তার ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠত।

এখন আমরা ছাপাখানার যুগে বাস করছি যখন আমাদের চারপাশে প্রচুর সংখ্যক বই আছে। অতএব গণশিক্ষার দ্বারা সমাজে পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্ভব। যাঁরা সংস্কারসাধনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে রত হন, তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন যে তাঁরা এই তথ্যটি সম্পর্কে অবহিত নন। যদি তাঁরা এই তথ্যটি উপলব্ধি করতেন, তাহলে তাঁরা তাঁদের বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে শিক্ষায় মনোনিবেশ করতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
মুসলিম বিশ্বে শান্তি

মানসিক শান্তি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ

মনই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং শান্তি হচ্ছে সবথেকে অনুকূল পরিবেশ যখন মন তার সর্বোচ্চ ক্ষমতায় কাজ করতে পারে। স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ এই মন। মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে এই ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য শান্তি প্রয়োজন, কারণ শান্তি ছাড়া কোনো কিছুই স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

রোমান সাম্রাজ্যের দ্বারা ইওরোপের অধিকাংশ এলাকা এবং আফ্রিকা প্রায় দুহাজার বছর শাসিত হয়েছিল। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে কোনো বৈজ্ঞানিক উন্নতি ঘটে নি। ঐতিহাসিকেরা সাধারণভাবে মনে করেন রোমান শাসনকালে চিন্তাভাবনার স্বাধীনতার অভাবই এর মূল কারণ। রাজার মতের সঙ্গে সামান্যতম পার্থক্য দেখা দিলে সেই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড হত। এই যুগের মূল কথা ছিল 'রাজা কোন ভুল করতে পারেন না।' অর্থাৎ কেবলমাত্র একজনেরই স্বাধীন চিন্তার সুযোগ ছিল এবং অন্য সকলের চিন্তনের সুযোগ প্রবলভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। এই পরিবেশের কারণে বৌদ্ধিক পরিসরে একধরনের বদ্ধতা লক্ষ করা গিয়েছিল।

১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লব বংশানুক্রমিক রাজতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতিতে ইতি টেনে পৃথিবীতে একটি নতুন গণতান্ত্রিক যুগের সূচনা করে। এই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির কারণে সমস্ত মানুষ স্বাধীন চিন্তার অধিকার অর্জন করে। আগে কেবলমাত্র রাজা চিন্তা করতে পারতেন, এখন প্রত্যেক ব্যক্তি চিন্তা করার জন্য স্বাধীন হয়ে উঠল। এইভাবে চিন্তন প্রক্রিয়া লক্ষকোটি গুণ বৃদ্ধি পেল। এই বৌদ্ধিক বিপ্লবের অর্থ ছিল যে বৈজ্ঞানিকেরা চিন্তনের ক্ষেত্রে বন্ধনমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে ভাবনাচিন্তা ও নতুন আবিষ্কারের সুযোগ পেলেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কারণে যোগাযোগ পদ্ধতি যা এতদিন প্রকৃতির মধ্যে সম্ভাবনা রূপে সুপ্ত ছিল, তা কঠোর বাস্তব হয়ে ওঠে। অবশ্যই ঈশ্বরের সৃষ্টি পরিকল্পনা অনুযায়ী এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই একদিন সুপ্ত ছিল - আধুনিক যুগের সুযোগসুবিধাগুলিও তার মধ্যে পড়ে।

কিন্তু যারা সামরিক তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত, তারা ঈশ্বরের সৃষ্টি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কাজ করছে এবং তা করতে গিয়ে তারা শান্তি নষ্ট করছে। বিষয়গুলির দৈব পরিকল্পনা অনুসারে, এটি প্রয়োজনীয় যে বিশ্বে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করবে যাতে মানুষ নির্বিঘ্নে চিন্তাভাবনা ও কাজ করবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। যখন একজন সন্ত্রাসবাদী একজন ব্যক্তিকে হত্যা করে, সে আসলে একটি মনকে হত্যা করে। যদি সে বহু মানুষকে হত্যা করে, সে বহু মনকে হত্যা করতে সক্ষম হয়।

এই অবস্থায়, যখন কিছু মানুষ নিজেদের নির্ধারণ করা লক্ষ্য অনুসারে সামরিকতায় নিযুক্ত হয়, তারা অবশ্যই এমন একটি কর্মে যুক্ত হচ্ছে যা সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত, কারণ, এই জাতীয় কর্মের দ্বারা তারা স্রষ্টার বিষয়বিন্যাসকে বিপর্যস্ত করছে।

মানুষের মনের ক্ষমতা অসীম, কিন্তু তা কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করতে পারে। কাজের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ না থাকলে, মনের ক্ষমতাগুলি অব্যবহৃত থাকবে -যে প্রক্রিয়ার দ্বারা মনের ক্ষমতার সূচনা ঘটে থাকে, সেই প্রক্রিয়াগুলি শুরু হতে পারে না। এই অবস্থায়, যারা সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত হয় ও তা প্রচার করে থাকে, তারা আসলে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়।

অভিজ্ঞতাও এই তথ্যের কথা বলে। মুসলমানরা যে সময় থেকে সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তখন থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমান বিশ্বে কোনো উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক উন্নতি ঘটেনি। সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায় আজ গ্রহীতার ভূমিকায় অবতীর্ণ - অতীতে এমন ছিল না। কোরানে উল্লিখিত প্রকৃতির একটি নীতি অনুসারে, যারা দাতার ভূমিকায় থাকে পৃথিবীতে তারাই সফল প্রমাণিত হয় (১৩ঃ১৭)।

মুসলমান সম্প্রদায়ের যারা সহিংসতায় লিপ্ত, তারা মুসলমানদের অগ্রগতির চিরস্থায়ী বাধা হয়ে উঠেছে। এই সমস্ত মানুষদের উচিত অবিলম্বে তাদের সহিংস কার্যকলাপ বন্ধ করে অস্ত্রশস্ত্রগুলি সমাধিস্থ করা, যাতে করে মুসলমান বিশ্বে শান্তি বিরাজ করতে পারে এবং সম্প্রদায়টি তার সৃজনশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে।

যে সমস্ত দেশে সন্ত্রাসবাদ বিদ্যমান, সেই দেশগুলিতে শিক্ষাগত ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। বিপরীতে, যে সমস্ত দেশে সন্ত্রাসবাদ নেই সেগুলিতে প্রগতি অব্যাহত। এর থেকে সেই প্রাচীন প্রবচনটি প্রতিষ্ঠা পায় যে শান্তি সমস্ত ধরনের উন্নতির সহায়তা করে আর সহিংসতার কারণে সমস্ত সৃজনশীল কর্ম ব্যাহত হয়।

মারামারি করে কোনো সৃজনশীল লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব নয়। মারামারি করলে গাছের বৃদ্ধি হয় না, পরিকল্পিত নগর নির্মাণ করা যায় না, একটি উন্নত সভ্যতা গড়ে

তোলা যায় না। যারা এই জাতীয় সংঘর্ষে রত থাকে, তারা জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন। যুদ্ধবিগ্রহ করে একটি ইতিবাচক লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা মানুষ এবং স্রষ্টা সম্পর্কে গভীর অবিবেচনার কাজ।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড শান্তির দ্যোতক। কিন্তু এই শান্তি বাধ্যতামূলক এই অর্থে যে এটি বাইরে থেকে আরোপিত। তারপর সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করতে চাইলেন যারা স্বেচ্ছায় বা স্ব-আরোপিত শান্তি গ্রহণ করতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি মানুষকে পৃথিবীতে পাঠালেন এবং যারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে তাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারের কথা বললেন।

যারা হিংসার সংস্কৃতি গ্রহণ করে তারা ঈশ্বরের সৃষ্টি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যায় এবং তাদের জন্য ঈশ্বরের প্রস্তাবিত সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি হারাবার ঝুঁকি গ্রহণ করে।

সহিংসতার সংস্কৃতির সবথেকে বড় অসুবিধা এই যে, যারা এর সঙ্গে যুক্ত হয় তারা এত দূর আত্মরক্ষামূলক হয়ে ওঠে, যে তারা মনে করে তারা আক্রমণের মুখে বাস করছে এবং তারা অবরুদ্ধ। এই ধরনের মানসিকতা সৃজনশীল চিন্তনকে ব্যাহত করে এবং অগ্রগতি রোধ করে বদ্ধতার জন্ম দেয়।

এই ক্ষতি এত বিশাল যে এক মুহূর্তের জন্যও সহিংসতা চালিয়ে যাওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

অসমাপ্ত কর্মসূচী

পাকিস্তানের সেনা প্রধান (চীফ অব আর্মি স্টাফ), জেনারেল রাহীল শরীফ , ৩ রা জুন ২০১৫ তারিখে ইসলামাবাদের জাতীয় প্রতিরক্ষা বিশ্ববিদ্যলয়ে (ন্যাশনাল ডিফেন্স ইউনিভার্সিটি) একটি সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, কাশ্মীর ও পাকিস্তান অবিচ্ছেদ্য এবং কাশ্মীর হচ্ছে 'দেশভাগের একটি অসমাপ্ত কর্মসূচী'।[১] পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের এই উক্তি বর্তমান সময়ের মুসলমান মন সম্পর্কে আমাদের অনেক কথা বলে। এটি প্রতীকিভাবে বোঝায় কেন বিশ্বজুড়ে মুসলমানরা সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত, কেউ সক্রিয়ভাবে, কেউ বা এই ধারায় চিন্তনের মাধ্যমে।

আপাতভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী আছে, কিন্তু তাদের সকলের মধ্যে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে প্রতিটি গোষ্ঠীরই একটি 'অসমাপ্ত কর্মসূচী' আছে, যেটি সে সক্রিয়ভাবে অর্জন করতে চাইছে। এই কাজের জন্য যে তাগিদ, তার প্রথম প্রেরণার জন্ম হয় মনের মধ্যে, তারপর তা অতি দ্রুত অভিযোগ ও প্রতিবাদের শাব্দিক রূপ ধারণ করে, শেষ পর্যন্ত তা সহিংস হয়ে ওঠে।

এই অসমাপ্ত কর্মসূচীটি ঠিক কী ? কিছু মুসলমানের জন্য তা পাকিস্তানের অসমাপ্ত কর্মসূচী, অন্যদের জন্য তা প্যালেস্টাইনের অসমাপ্ত কর্মসূচী, আরো অন্যদের জন্য খিলাফতের অসমাপ্ত কর্মসূচী, কিন্তু মুসলমানের জন্য আবার এটি শরিয়ার অসমাপ্ত কর্মসূচী। এই রকম বিবিধ অসমাপ্ত কর্মসূচীর জন্য বর্তমানকালের মুসলমানরা তাঁদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ।অথচ দীর্ঘসময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও কোনো গোষ্ঠী তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সফল হয়নি।

এই ব্যর্থতা ঘটলকেন ? কোরানের একটি আয়াত এ বিষয়ে আলোকপাত করে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

যদি তোমরা যথার্থ বিশ্বাসী হও, তোমরা তাদের জয় করতে পারবে' (৩ঃ১৩৯) ! কোরানে এমন অনেক আয়াত আছে যা আমাদের বলে যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নির্দিষ্ট প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করে, সে জগতে সফল হয়। যারা প্রকৃতির নিয়মের বিরোধিতা করে তারা কখনই তাদের প্রচেষ্টায় সফল হতে পারে না। তারা মুসলমান হক বা অন্য কিছু, প্রকৃতির নিয়ম সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, বিশ্বজনীন নীতি এই যে এই পৃথিবীতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠীর এক চেটিয়া নয়- কখনও তা একদলের হাতে থাকবে, অন্য সময় অন্য দলের। কোরানে একাধিক জায়গায় এই নীতির কথা আছে। যেমন, কোরানে এক জায়গায় বলা হচ্ছে ঃ

'প্রভু! সকল শ্রেষ্ঠতার শ্রেষ্ঠ! তুমি যাকে ইচ্ছা কর তার উপর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ষণ কর এবং যার থেকে ইচ্ছা কর, সেই শ্রেষ্ঠত্ব হরণ কর' (৩ঃ২৬)।

এই নীতি অনুসারে, যুদ্ধে ব্যাপৃত হওয়া সত্ত্বেও নিজের লক্ষ্য অর্জন করতে না পারা প্রমাণ করে যে সেই ব্যক্তি ভুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন - তিনি এমন কিছু অর্জন করতে চাইছিলেন, দৈব অনুশাসন অনুসারে, যা অর্জন করা অসম্ভব।এই রকম অবস্থায়, কোনো গোষ্ঠীর জন্য যুদ্ধ শুরু করা অনুমতিদানের যোগ্য হতে পারে, কিন্তু যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াটা কখনই ন্যায্যতা পেতে পারেনা।

এটা সম্ভব যে একটি গোষ্ঠী অবস্থার ভুল মূল্যায়ন করার কারণে যুদ্ধে রত হলেন। কিন্তু যখন সেই গোষ্ঠী জানতে পারে যে জীবন এবং সম্পত্তির যাবতীয় হানি সত্বেও সে তার নির্বাচিত পথে সফল হতে পারছে না, তখনই তার ঐ ভুল পথ ত্যাগ করে সঠিক পথ অবলম্বন করা উচিত। এই বিষয়ে প্রাথমিক একটি ভুল শুরুকে ক্ষমা করে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সঠিক লক্ষ্যের থেকে ক্রমাগত বিচ্যুতি যথেষ্ট অমার্জনীয়।

আজকাল মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী একটি অপূর্ণ কর্মসূচী সম্পাদনের জন্য যুদ্ধ করছেন। কিন্তু ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে নিজেদের লক্ষ্যপূরণে এই গোষ্ঠীগুলি সম্পূর্ণভাবে অকৃতকার্য। অতএব, প্রতিটি গোষ্ঠীর সঠিক পথে আসার সময় হয়েছে। প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যে প্রতিটি গোষ্ঠী অবিলম্বে তাদের বর্তমান সংঘর্ষ সহিংসতা বন্ধ করে, কোরান ও হাদিস পাঠ করে আবিষ্কার করবে কোন কাজে তাদের আত্মনিয়োগ করা উচিত।

মুসলমানদের জন্য সহিংসতা কোনো পছন্দের বিষয় হতে পারে না, যেমন রাজনৈতিক লাভের জন্য সংগ্রাম তাদের লক্ষ্য হতে পারে না। মুসলমানদের সামনে একটিই পথ খোলা আছে, সেটি হল শান্তিপূর্ণ দাওয়াহ্ কর্মে নিয়োজিত হওয়া।

কোরান পাঠ করলে বোঝা যায় যে এর বাণী সমগ্র মানবতার জন্য এসেছিল(২৫ঃ ১)। অতএব মুসলমান জনসম্প্রদায়ের জন্য অসমাপ্ত কর্মসূচী মাত্র একটিই- তা হল কোরানীয় শিক্ষার বিশ্বব্যাপী প্রচার।

মুসলমানদের উচিত অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজেদের অসাফল্যকে দৈব চিহ্ন হিসেবে পাঠ করা। তাদের উপলব্ধি করতেই হবে যে ঈশ্বর তাদের বর্তমান কার্যকলাপ বিষয়ে প্রীত নন। ঈশ্বর চান তারা সঠিক অসমাপ্ত কর্মসূচীর জন্য কাজ করুক। সেটি করলে তারা অবশ্যই ঈশ্বরের সাহায্য লাভ করবে। কোরানে যেমন বলা হয়েছে ঃ

'ঈশ্বর নিশ্চয় তাদের সাহায্য করবেন যারা তাঁর উদ্দেশ্যপূরণে সহায়তা করে - কারণ ঈশ্বর ক্ষমতাবান ও সর্বশ্রেষ্ঠ' (২২ঃ৪০)।

যারা সেই সঠিক কাজ, অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ দাওয়াহ্ কর্মে নিজেদের নিযুক্ত করবে, ঈশ্বর তাদের সহায়তা করার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ডি গলের পদ্ধতি পথ দেখাচ্ছে

ষোড়শ শতাব্দিতে যখন ইওরোপীয় উপনিবেশবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল, ব্রিটিশরা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এসে উপস্থিত হলেন আর ফরাসীরা পৌঁছে গেলেন আফ্রিকার বিভিন্ন দুর্গম প্রান্তে। ১৮৩০ সালে ফরাসীরা অ্যালজিয়ার্স অধিকার করেন এবং এইভাবেই উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী উপনিবেশবাদের সূচনা হয়। সপ্তদশ শতক থেকে ফরাসীরা আফ্রিকায় বহু উপনিবেশ স্থাপন করতে থাকে এবং ক্রমে পনেরোটি দেশজুড়ে তাদের শাসন বিস্তৃত হয়।

এই ধরণের ফরাসী বিস্তার আফ্রিকার মানুষদের মধ্যে রাজনৈতিক অসন্তোষ সৃষ্টি করবে এটা স্বাভাবিক ছিল। ফলে বিদেশীদের শাসনমুক্ত করতে আফ্রিকা মহাদেশে অনেকগুলি স্বাধীনতা আন্দোলন সূচিত হয়। এই স্বাধীনতা আন্দোলনগুলিকে দমন করতে ফরাসীরা বারবার আফ্রিকায় সৈন্যবাহিনী নামাতে থাকে। একটা সময় ফ্রান্সের জন্য সামরিক খাতে ব্যয় অসহনীয় হয়ে ওঠে, প্রগতি ও উন্নয়নের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পারমাণবিক দৌড়ে ফ্রান্স অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়ে।

১৯৫৮ সালে চার্লস ডি গল যখন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবনতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ফ্রান্সের জাতীয় গৌরব রক্ষা করার কোনো দায় ডি গলের ছিল না, দেশকে নতুন প্রাণে উজ্জীবিত করা তাঁর কাছে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় ছিল। তিনি যখন বিষয়টি নিয়ে নির্মোহভাবে ভাবলেন, তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে ফ্রান্সকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে আফ্রিকায় ফরাসী উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা প্রদান বাধ্যতামূলক। তিনি আফ্রিকান নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ফ্রান্সের শাসনাধীন আফ্রিকান দেশগুলিকে স্বাধীনতা প্রদান করলেন।

এটি একটি চূড়ান্ত পদক্ষেপ ছিল এবং এর জন্য ডি গলকে চূড়ান্ত মূল্য দিতে হয়েছিল। ফ্রান্সের জনপ্রিয়তাহীন এক নেতা হিসেবে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে তাঁকে ১৯৬৯ সালে পদত্যাগ করতে হয় এবং তাঁর মৃত্যু ফ্রান্সে কোনো বড় ঘটনার স্বীকৃতি পায় নি।

কিন্তু ডি গলের নীতির জন্যই ফ্রান্স দ্রুত উন্নতি করতে শুরু করে এবং সেই দেশ এখন পারমাণবিক বিজ্ঞানে ইওরোপে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এই উদাহরণ থেকে বর্তমান কালের মুসলমান নেতাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তাদের নেতৃত্ব কোনো ইতিবাচক লাভ আনার পরিবর্তে মুসলমানদের ক্ষতি করেছে। এই রকম অবস্থায়, যে নেতারা বর্তমান সহিংস আন্দোলনের নেতৃত্বে আছেন, তাঁদের উচিত তাঁদের নীতির সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটানো। সহিংসতা ত্যাগ করে তাঁদের একটি শান্তিপূর্ণ পথ অবলম্বন করা উচিত।

এই রকম চূড়ান্ত নীতি গ্রহণ করার জন্য তাদের নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিহত হতে পারে, কিন্তু যতদূর পর্যন্ত মুসলমান সমাজের কথাটি সামগ্রিকভাবে জড়িয়ে, সেই সমাজ নিশ্চয় সৃজনশীল ধারায় উন্নতি করতে শুরু করবে। একটি অনগ্রসর সম্প্রদায়ের তকমা ছেড়ে তারা প্রগতিপন্থী সম্প্রদায় হিসেবে যাত্রা শুরু করবে।

এই উন্নতির সবথেকে ইতিবাচক দিকটি হবে এই যে, বিশ্ববাসীর চোখে ইসলামের যে ভাবমূর্তি, তার বিশাল পরিবর্তন হবে। এই এতগুলি বছরে অবিরাম মুসলমান সশস্ত্র সহিংসতার কারণে, সাধারণভাবে মানুষের একটা বিশ্বাস জন্মে গিয়েছে যে ইসলাম একটি সহিংস ধর্ম। কিন্তু মুসলমানরা যদি শান্তিপূর্ণ পথ অবলম্বন করে, তাহলে ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ধর্ম হিসেবে পরিচিত হবে, যে ধর্ম তার অনুগামীদের শান্তিপূর্ণ ভাবে বাস করতে ও কাজ করতে শিখিয়েছিল। অবশ্যই, ইসলামের একটি সঠিক চিত্র তুলে ধরা আজ সবথেকে বেশী প্রয়োজন।

চার্লস ডি গল আসলে যা করেছিলেন তা কোনো একজন ব্যক্তির একক নীতি নয়, এর ভিত্তি ছিল প্রকৃতির নিয়মে। সাধারণভাবে এই নীতিকেই ইউ-টার্ন নীতি, চলতি গতিপথের সম্পূর্ণ বিপরীত পথ গ্রহণ বোঝাতে, বলা হয়ে থাকে।

একথা বলা হয়ে থাকে যে মানুষমাত্রেই ভুল করে। একজন ব্যক্তি বা একটি জাতি কোনো ভুল করতেই পারে। কিন্তু যখন কারো কাজের ফলে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হয় না, তখন তার উচিত অবিলম্বে নিজের নীতি পুর্ণবিচার করে দ্রুত ইউ-টার্ন নীতি গ্রহণ করা। শেষ পর্যন্ত সমস্ত ভুলই সংশোধনযোগ্য। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীতির পরিবর্তন রক্ষাকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

এই যুগে আজকের দিনে, কিছু মুসলিম নেতা সহিংস কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন। যদিও এই পথ সমস্ত নেতা গ্রহণ করেনি, মাত্র মুষ্টিমেয় কিছু নেতাই গ্রহণ করেছেন, তবুও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে তা বিপুলসংখ্যক মুসলমান জনসাধারণের সমর্থন অর্জন করেছে।

অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে এই পথটি সঠিক নয় কারণ এর থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা সম্ভব হয় নি।

এই রকম অবস্থায়, দেরী করে হলেও মুসলমানদের সঠিক পথ গ্রহণের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত ।এবং নিজেদের নীতির সামগ্রিক পুনর্মূল্যায়ন করা কাম্য।

ডি গলিজম আসলে এক ফরাসী রাষ্ট্রপতির গৃহীত নীতি মাত্র নয়, এই নীতি বিশ্বজনীন প্রকৃতির নিয়মের অনুসারী। প্রকৃতির নিয়ম বলে যে গৃহীত নীতি যদি কার্যকরী না হয়, তাহলে সেই নীতি থেকে পিছিয়ে আসার কৌশলের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে পশ্চাদপসারণ আসলে অগ্রসরতার নামান্তর, অনেক বেশী ফলপ্রসূ।

প্রশমিত ধারা, উচ্চকিত ধারা

জামাল আদ-দিন-আল-আফগানি (১৮৩৯-১৮৯৭) তাঁর সমাজদর্শনের উজ্জ্বলতম রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তাঁর অসাধারণ গুণাবলীর কারণে আফগানিস্তান, ইরান, মিশর এবং তুরস্কের মত বহু মুসলমান দেশে তাঁকে বহু উচ্চপদের প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু যাবতীয় নেতিবাচক কর্মকান্ডের জন্য তিনি অচিরেই সর্বত্র অবাঞ্ছিত হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর লক্ষ্য পূরণ করতে পারেন নি এবং ষাট বছর বয়স হওয়ার আগেই, হতাশাগ্রস্ত হয়ে মারা যান।

আল-আফগানি এবং তাঁর শিষ্য, মুহাম্মদ আবদুহ্ (১৮৪৯-১৯০৫) প্যারিসে তাঁদের কর্মকান্ডের কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৮৪ সালে তিনি *আল-উরওয়া আল-যুথকা* (অচ্ছেদ্য সংযোগ) নামে প্যারিস থেকে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক চরমপন্থার করণে, মুহাম্মদ আবদুহ্ তাঁর সঙ্গে সহমত হতে পারেন নি। তিনি প্যারিসে আল-আফগানিকে জানান যে তাঁরা রাজনৈতিক কাজে বৃথা সময় নষ্ট করছেন, তাঁদের বরঞ্চ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে শান্তিপূর্ণ ভাবে মুসলমান যুব সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করা উচিত । আল-আফগানির এই প্রস্তাব পছন্দ হয়নি এবং তিনি উত্তর করেন : ইন্নামা আন্তা মুথাব্বিৎ (তোমার কথা নিরুৎসাহব্যঞ্জক)। এরপর আবদুহ্ আল-আফগানির সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করেন ও প্যারিস ত্যাগ করে মিশর চলে যান।

মুহাম্মদ আবদুহ্ কর্মপদ্ধতির একটি প্রশমিত ধারার প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু আল-আফগানি মনে করেছিলেন উচ্চকিত ধারার কর্মধারাই একমাত্র সঠিক পথ। তাঁর মনে হয়েছিল রাজনৈতিক সংগ্রাম একটি উচ্চকিত ধারার উদ্যোগ এবং মানুষকে শিক্ষিত করার প্রয়াস একটি প্রশমিত ধারার প্রকল্প। পরবর্তী ক্ষেত্রটিতে একজন মানুষ বাস্তবের ভিত্তিতে তার পরিকল্পনা গুলি করে। এর অর্থ নিজেকে কম দৃশ্যমান অবস্থায় রাখা, কারণ এইভাবে অগ্রসর হলে জনগনের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় কম, লোকে এটা কোনো বড় কাজ বলে মনেই করে না।

এর উল্টোদিকে, উচ্চকিত ধারার কর্মধারায় একজন মানুষ বড় বড় পরিকল্পনা করে, সে বিষয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে অনেক উচ্চ কথা বলে এবং তার ফলে তার দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যদি আমরা ফলের মাত্রায় দেখি, তাহলে দেখব যে আসলে প্রশমিত ধারার কর্মপদ্ধতি অধিক ফলপ্রসূ, উচ্চকিত ধারার কর্মপদ্ধতি খুব ফলপ্রসূ নয়। প্রথম পদ্ধতিটিতে, ব্যক্তি শান্তিপূর্ণ পথের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকে; দ্বিতীয় পদ্ধতিটিতে সে অতি দ্রুত সংঘাত ও সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ে।

তারা মানবতার সবথেকে বড় সম্পদ, যারা উচ্চতর গুণাবলী, অর্থাৎ অসাধারণ মেধাদীপ্তি এবং বিশাল মানসিক শক্তি ও প্রত্যয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু এটি ইতিহাসের দুঃখজনক অভিজ্ঞতা যে এই ধরনের গুণসম্পন্ন মানুষরা প্রায়শই ব্যর্থ অভিযানের শিকার হয়ে পড়ে। তার কারণ এই যে, তারা উচ্চকিত ধারার কোনো উদ্যোগ ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করতে রাজি থাকে না। সেই কারণে তারা হাতের কাজটি সম্পর্কে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে না এবং এর ফলে তারা সাধারণ ভাবে জীবনে হেরে যায়। তারা নিজেদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ কিছু করে উঠতে পারে না, অন্যদের জীবনকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না।

শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি বিনয় গড়ে তোলে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি সহিংস পদ্ধতি গ্রহণ করে সে অতি দ্রুত উদ্ধত হয়ে ওঠে। শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির দ্বারা যে কোনো মানুষের সৃজনশীল ধারায় ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং একমাত্র এই পদ্ধতির দ্বারাই ইতিবাচক ফললাভ হয়। বিপরীতে, সহিংস পদ্ধতি মানুষের ব্যক্তিত্ব ও তার হাতে থাকা সম্পদকে ধ্বংস করে।

প্রশমিত ধারার কর্মপদ্ধতি সাফল্যের দিকে নিয়ে যায় আর উচ্চকিত কর্মধারার পদ্ধতি অবস্থার অবনতি ঘটাতে থাকে। এর কারণ এই যে প্রশমিত কর্মধারা অনুসারে কাজ করা আসলে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে কাজ করা। এই পৃথিবীতে যারা প্রকৃতির নিয়ম মেনে কাজ করে, শুধুমাত্র তারাই সাফল্যলাভের উপযুক্ত।

একটা গাছের উদাহরণ নেওয়া যাক; একটা ছোট্ট বীজ থেকে তার জন্ম। বীজের বৃদ্ধি শুরু হওয়া থেকে একটি পূর্ণ-পরিণত বৃক্ষে পর্যবসিত হতে কুড়ি-ত্রিশ বছর সময় লাগে। ধীরে ধীরে গাছটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই ক্রমান্বয়িক বৃদ্ধি আসলে প্রশমিত ধারার কর্মপদ্ধতির সঙ্গে তুলনীয়। বৃক্ষ যদি প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যায়, তবে তা কখনই পূর্ণ-পরিণত বৃক্ষ হয়ে উঠতে পারবে না। অনুরূপভাবে, জীবনে প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ না করলে কোনো ব্যক্তিই এই পৃথিবীতে সফল হয়ে উঠতে পারবে না।

একথা সত্য যে একটি সমাজ বা একটি সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকে মানুষকে তার কাজকর্ম করতে হয়। অতএব, তার নিজের বাইরে থাকা আরো কিছু উপাদান বিষয়ে মনোনিবেশ করা তার জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এটা করতে গেলেই অবধারিতভাবে সে প্রশমিত ধারার কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করবে। অপরদিকে, যে স্বার্থপর ব্যাক্তি কেবল নিজেকে নিয়েই ভাবিত, যে অন্য উপাদানগুলির কথা ভাবে না, তার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী।

এটিই সাফল্যের গোপন কথা। যারা এই নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ, তারা সহিংস হয়ে ওঠে। সচেতনতার অভাবেই ব্যাক্তি সহিংস হয়ে ওঠে। যদি কোনো ব্যক্তি অসচেতনতার বৃত্ত থেকে নিজেকে বার করে নিয়ে আসতে পারে, সে কখনই সহিংস কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করবে না।

শান্তির পথ

মহাবিশ্বে সমস্ত বিষয়ই পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল। এগুলি পরস্পরের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত যে একের অস্তিত্বের জন্য অন্যের প্রয়োজন। যে বিশ্বজনীন নিয়ম এই পারস্পরিক সম্পর্কগুলি পরিচালনা করছে তা মানব সমাজের জন্যও প্রযোজ্য এই অর্থে যে, মানবজগতে একমাত্র তখনই কোনো বড় কিছু ঘটতে পারে, যখন প্রতিটি ব্যক্তি একে অন্যের ক্ষেত্রে অনধিকার চর্চা না করে, নিজের ভূমিকা পালন করতে সফল হবে।

আমরা বর্তমানে প্রায় সর্বত্রই মুসলমানদের জঙ্গী কার্যকলাপ দেখতে পাচ্ছি। মুসলমান দেশগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। মুসলমান দেশগুলিতে, যেখানে শাসক মুসলমান এবং মুসলমান প্রশাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান, সেখানেও কেন এই জঙ্গীপনার সাক্ষ্য পাওয়া যায়? সেটা সম্ভবত এই কারণে যে এই সমস্ত মুসলমানরা বিশ্বজনীন নীতিটি অনুসরণ করে না।

এই বিষয়টিতে আলোকপাত করার জন্য আমি মুসলমান বিশ্ব থেকে দুটি উদাহরণ দেব। মিশরে, ১৯৫২ সালে রাজা ফারুকের শাসনকাল শেষ হয়েছিল। তারপর গামাল আব্দেল নাসের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় মুসলমান ভ্রাতৃত্ব সরকারের বিরোধিতার ভূমিকা নেয়। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার সংঘর্ষ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সমস্যার সমাধানে, তৎকালীন রাষ্ট্রপতি গামাল আব্দেল নাসের মুসলমান ভ্রাতৃত্বের কাছে একটি ভালো প্রস্তাব দেন। কিন্তু মুসলমান ভ্রাতৃত্বের নেতা, সৈয়দ কুতুব্ এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এই তথ্যটি উল্লেখ করা হয়েছে *দ্য লাইভ্স্ অব টু রিভাইভার্স---হাসান আল-বান্না অ্যান্ড সৈয়দ কুতুব্* (দুই পুনর্জাগরণকারীর জীবন—হাসান আল-বান্না এবং সৈয়দ কুতুব্) নামক গ্রন্থে :

'নাসের...মিশর রাজতন্ত্রটুকু বাদ দিয়ে কুতুব্‌কে অন্য যে কোনো পদ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন : " আপনি সরকারে যে পদ চান, তাই আপনাকে দেওয়া হবে, তা সে শিক্ষা মন্ত্রকেই হ'ক, বা শিল্প মন্ত্রকে, ইত্যাদি।" কুতুব্ সমস্ত প্রস্তাব নাকচ করে দেন।[১]

সৈয়দ কুতুব্ আরব জগতের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন এবং উপরের প্রস্তাবগুলির যে কোনো একটি গ্রহণ করলে তাঁর জন্য বহু সম্ভাবনা উন্মোচিত হত। অনুরূপভাবেই প্রাচীন মিশরের তৎকালীন রাজা দিব্যপ্রেরণা প্রাপ্ত প্রচারক যোশেফকে কৃষি বিভাগে একটি উচ্চপদ গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই একই দেশে, সমসাময়িক সরকার সৈয়দ কুতুব্কে শিক্ষা বিভাগের শ্রেষ্ঠ পদটি দিতে চেয়েছিল। এই প্রস্তাব গ্রহণ করে তাঁর লোকেদের শিক্ষিত করে তোলার পরিকল্পনাই সৈয়দ কুতুবের জন্য সুবিবেচনার কাজ হত। যদি তিনি তা করতেন, তা হলে তিনি মিশরের সম্পূর্ণ একটি নতুন প্রজন্মের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারের জায়গায় থাকতে পারতেন। এইভাবে, প্রশাসকের ভূমিকায় না থেকেও, শিক্ষাবিদের ভূমিকায় তিনি যেরকম চেয়েছিলেন, তাঁর দেশে সেইরকম ভাবে ইসলাম নিয়ে আসতে পারতেন।

একই জিনিস ঘটেছিল পাকিস্তানে। ১৯৫৮ সালে যখন জেনারেল আয়ুব খান পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন, সৈয়দ আবুল আলা মওদুদি ও তাঁর দল তখন ‘পাকিস্তানের ইসলামিকরণ’-এর নামে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেই সময় মিশরের মত পাকিস্তানেও একই ঘটনা ঘটেছিল।

ভ্যানগার্ড অব দি ইসলামিক রেভোলিউশন: দ্য জামাত-ই ইসলামি অব পাকিস্তান (ইসলামিক বিপ্লবের অগ্রভাগ: পাকিস্তানের জামাত-ই ইসলাম) নামক বইয়ে সৈয়দ ওয়ালি রেজা নসর লিখছেন; ‘১৯৬২ সালে লাহৌরের একটি যাত্রাপর্বে তিনি (জেনারেল আয়ুব খান) মওদুদিকে রাজভবনে আমন্ত্রণ জানান। রাজনীতি বিষয়টিকে রাজনীতিবিদদের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাঁকে ধর্মতত্ত্ব পাঠে মনোনিবেশ করার পরামর্শ দেন। এই বিষয় মওদুদিকে উৎসাহিত করার জন্য তিনি তাঁকে ভাওয়ালপুর ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করে দেওয়ারও প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পরামর্শ এবং প্রস্তাব- মওদুদি দুটিই প্রত্যাখ্যান করেন।’[২] আয়ুব খানের এই প্রস্তাব সৈয়দ আবুল আলা মওদুদির জন্য সুবর্ণ সুযোগ ছিল। এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে, তিনি সমগ্র পাকিস্তান জুড়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে সংগঠিত করতে পারতেন এবং একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রজন্মের মনকে তৈরি করতে পারতেন। তারাই ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সংস্কার সাধনে সহায়ক হতে পারত। কিন্তু এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে তিনি একটি মস্ত সুযোগ হারালেন।

আজকের মুসলমান সমাজের সামনে অত্যন্ত চিন্তার বিষয় এই যে তারা শিক্ষাজগতের আন্তর্জাতিক দৌড়ে পিছিয়ে পড়েছে। এই পশ্চাদপরতার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে বর্তমান কালের মুসলমান নেতাদের ওপর বর্তায়, যাঁরা বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সম্ভাবনাগুলিকে চিহ্নিত করতে পারেন নি এবং বিচক্ষণ

পরিকল্পনার দ্বারা সেগুলি সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কেন বর্তমান কালের মুসলমানরা সহিংসতার সংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়েছে? এর একটিই মাত্র কারণ; আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের পশ্চাদপরতার কারণে, তারা আধুনিক যুগের প্রকৃতিটি চিনতে ব্যর্থ হয়েছে।

আধুনিক যুগ ইসলামের জন্য একটি সমর্থক উপাদান ছিল, কিন্তু নিজেদের শিক্ষাগত পশ্চাদপরতার কারণে মুসলমানদের মনে হয়েছে, এটি ইসলামের জন্য প্রতিকূল। এটিই প্রাথমিক কারণ, যে জন্য মুসলমানরা তাদের পুনরুত্থানের জন্য শান্তি পূর্ণ পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ হল এবং বিচক্ষণতার অভাব প্রতিষ্ঠা করে সহিংসতার সংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়ল। এই সত্যটি যখন তারা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করবে, একমাত্র তখনই মুসলমানদের জন্য একটি নতুন ভবিষ্যৎ সম্ভব হবে।

ধারাপ্রতিষ্ঠার ভূমিকায় ধর্মযুদ্ধগুলি

ইতিহাসের দীর্ঘতম যুদ্ধগুলির মধ্যে অন্যতম ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেডগুলি। এই ধর্মযুদ্ধগুলি শুরু হয় ১০৯৫ খৃষ্টাব্দে এবং মাঝেমধ্যে স্বল্পকালীন বিরতিসহ দুশো বছর চলেছিল; শেষ পর্যন্ত ১২৯১ খৃষ্টাব্দে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই যুদ্ধগুলিতে সমস্ত মুসলমান শাসকরা একটি পক্ষের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অপরদিকে ছিল ইওরোপীয় খ্রীষ্টান দেশগুলি। সেই সময়ের প্রায় সমস্ত খ্রীষ্টান শাসক এই ধর্মযুদ্ধগুলিতে যোগদান করেছিল। দুশো বছরের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষ ফল হিসেবে মুসলমানরা জয় লাভ করেছিল এবং খৃষ্টানরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল।

চর্তুদশ শতাব্দীর পৃথিবীতে উদযাপনের জন্য এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলমান দেশগুলির সামনে একটি বিশাল জয়ের দৃষ্টান্ত ছিল; অপরদিকে ইওরোপীয় খৃষ্টান দেশগুলির সামনে পরাজয়বোধ ছাড়া আর কিছু ছিল না। আজকে, অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। বর্তমান কালের মুসলমানরা একটি পর্যুদস্ত পরাজিত মানসিকতায় ভুগছেন। উল্টোদিকে, আমেরিকা সহ ইওরোপের খৃষ্টান দেশগুলি আজ মুসলিম দেশগুলির উপর তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

দুইয়ের মধ্যে এই আশ্চর্যজনক পার্থক্য কেন? তার কারণ এই যে ধর্মযুদ্ধগুলি দুই ধরণের দেশের মধ্যে পৃথকভাবে দুটি ধারা প্রতিষ্ঠা করেছিল। মুসলমানরা মনে করেছিলেন যুদ্ধ সাফল্য অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপায়। খৃষ্টান দেশগুলি বাধ্য হয়েই অন্যরকমভাবে ভাবতে শুরু করেছিল। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে সফল হতে পারেনি বলেই শান্তিপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে নিজেদের শক্তি নিয়োজিত করে। খৃষ্টানরা এই উদ্যোগগুলির নাম দিয়েছিলেন ‘আধ্যাত্মিক ধর্মযুদ্ধ’। আমার মনে হয়, ‘শান্তিপূর্ণ ধর্মযুদ্ধ’ বললে আরো ভালো হত। এরপর খৃষ্টান দেশগুলিতে অধ্যয়ন এবং গবেষণার মত সৃজনশীল কাজের ভিত্তিতে ধীরে ধীরে একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়। সেই সময়ের সমস্ত বই সংগ্রহ করে বিভিন্ন ইওরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। প্রকৃতি সহ জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

দীর্ঘদিন ধরে এই শান্তিপূর্ণ অধ্যয়ন ও গবেষণা প্রক্রিয়া চলতে থাকার কারণে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের খৃষ্টান ইউরোপে রেঁনেসা বা নবজাগরণ সূচিত হয়।

বিজ্ঞান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অব্যাহত উন্নতি হতে থাকে, যার ফলে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে এক নতুন পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। সেই পৃথিবী প্রাচীন কালের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পশ্চিমী সভ্যতার উন্নতির শিখরে পৌঁছে আমরা দেখি মানুষের ইতিহাসে প্রথমবার 'ক্ষমতা'-র ধারণাকে কেন্দ্র করে একটি বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। প্রাচীনকালে যুদ্ধের ভিত্তিতে ক্ষমতা নির্ধারিত হত। এখন, এই নতুন যুগে, যাকে যথার্থই ' বৈজ্ঞানিক যুগ' বলা হয়, শান্তি ক্ষমতার উৎস হয়ে ওঠে। ধর্মযুদ্ধগুলির সময়ে মুসলমান দেশগুলি যুদ্ধ জিতে নিজেদের বিজয় প্রতিষ্ঠা করেছিল। এখন, বর্তমান সময়ে, খৃষ্টান দেশগুলি শান্তিপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করে আরো অনেক বড় জয় প্রতিষ্ঠা করেছে। বর্তমান সময়ে বহু মুসলমান সহিংসতার ধারায় চিন্তাভাবনা করার প্রবণতা প্রকাশ করে। তারা বহু স্থানে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে বোমা-বন্দুকের সংস্কৃতির প্রচার করে। কিন্তু দীর্ঘ সময়ে ধরে, মুসলমানদের অসাধারণ আত্মত্যাগ সত্ত্বেও তারা কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি; পাশাপাশি পশ্চিমী দেশগুলির উত্তরণ ও উন্নতি অব্যাহত। বর্তমান সময়ে মুসলমানদের সহিংস কর্মকান্ডের সম্পূর্ণ ব্যর্থতার কারণ কী ? এর একমাত্র কারণ, আধুনিক সময়ে প্রাচীন রীতি-পদ্ধতির ব্যবহার। অন্য কথায় বলতে গেলে, শান্তির যুগে যুদ্ধের সংস্কৃতি নির্বাচন। মুসলমানরা অবশ্য তাদের ব্যর্থতার জন্য পশ্চিমী দেশগুলির ষড়যন্ত্রকে দায়ী করে। কিন্তু, বর্তমান সময়ে, মুসলমানদের ব্যর্থতার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে তাদের নিজেদের মধ্যেই। আধুনিক যুগে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে তারা একেবারেই সচেতন নয়। তার ফলে তারা অনুপুযুক্ত নীতি গ্রহণ করে থাকে। একবিংশ শতাব্দীতে মুসলমানদের জন্য বন্দুকের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করার সময় হয়েছে। এছাড়া তাদের কাছে আর কোনো পথ নেই।

জাতীয় জীবনে সেই সমস্ত ঘটনাগুলিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয় যেগুলি কোনো ধারা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। আধুনিক সময়ে মুসলমানদের ব্যর্থতার প্রধানতম কারণ এই যে তারা ক্রুসেডগুলিকে ধারা প্রতিষ্ঠার নির্ণায়ক মনে করেছিল। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে অন্য আর সব কিছুর থেকে যুদ্ধ বৃহত্তর বিষয়। সেই সময় থেকে তারা এই ধরনের ভাবনাই ভেবে চলছে।

অপরদিকে, খৃষ্টান দেশগুলির জন্যও ধর্মযুদ্ধের ঘটনাবলী ধারা প্রতিষ্ঠার ভূমিকা গ্রহণ করেছিল; কিন্তু তা অন্য ভাবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে, তারা শান্তির পথ অবলম্বন করে এবং দীর্ঘ সময় সেই পথেই থাকে।

শেষ পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে তারা ‘ক্ষমতা’ নির্ধারণের বৈশিষ্ট্যটি পরিবর্তিত করেছিল। **আগেকার সময়ে সামরিক শক্তিকে ক্ষমতার উৎস বলে মনে করা হত; আর আজ শান্তি ক্ষমতার ভিত্তি হয়ে উঠেছে।**

যখন মুসলমানরা এই বাস্তব অবস্থাটি অনুধাবন করতে পারবেন এবং সেই অনুসারে নিজেদের পাল্টাতে পারবেন, তখন তাঁদের জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা হবে।

নীতিরূপে ভ্যাটিকান

বৃহত্তর রোম শহরের মধ্যে একটি প্রাচীর বেষ্টিত অঞ্চলের নাম ভ্যাটিকান সিটি। আয়তনে ১১০ একর মত এলাকা এবং ৮০০-এর কিছু বেশী জনসংখ্যা নিয়ে এটিই পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত। হোলি সী এবং ইতালির সরকারের মধ্যে ১৯২৯ সালের ল্যাটেরান চুক্তির ভিত্তিতে এই স্বাধীন নগর-রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বহু শতাব্দী ধরে, প্রতিটি পোপই ছিলেন ইওরোপের অঘোষিত মুকুটহীন রাজা। আজও রোম শহরে পোপের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রাসাদ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে গীর্জা এবং ইহজাগতিক (সেকুলার) জনগণের মধ্যে প্রবল মত পার্থক্য গড়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত পোপ দেখলেন যে, তিনি তাঁর পূর্বের অবস্থানে ফিরে যেতে পারবেন না। তখন তিনি ভ্যাটিকান সিটির এলাকার মধ্যেই তাঁর নিয়ন্ত্রণ সীমিত রাখতে সম্মত হলেন। ইতালি সরকারও এই ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিল। ক্রমে দেখা গেল, এই ছোট এলাকা থেকেও পোপ শুধু ইতালি নয়, বিশ্বের আরো বিভিন্ন স্থানে তাঁর মহান ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন।

ভ্যাটিকানের এই ইতিহাস আমাদের একটি প্রয়োজনীয় নীতি শিক্ষা দেয়; যদি তুমি পুরোটার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারো, তাহলে একটি ছোট অংশে নিজেকে সীমিত করার বিষয়ে সম্মত হও। যে সমস্ত মুসলমানরা বিভিন্ন দেশে যুদ্ধে রত আছেন, তাঁদের উচিৎ একই উপায়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সফল হয়ে ওঠা— অর্থাৎ, তাঁরা যেন একটি "ভ্যাটিকান" গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকেন।

সাদ্দাম হুসেন (১৯৩৭- ২০০৬) -এর উদাহরণটি দেখা যাক। তিনি প্রায় একুশ বছর ইরাকের শাসক ছিলেন। তাঁর সময়ের শেষ দিকে, পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে ওঠে এবং এটি স্পষ্ট হয় যে তিনি আর তাঁর আগের অবস্থা ধরে রাখতে পারবেন না। কিন্তু তিনি অনাবশ্যক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকলেন, শেষ পর্যন্ত ২০শে ডিসেম্বর,২০০৬ তারিখে তাঁর ফাঁসি হয়। সাদ্দাম হুসেন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যদি ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন, তাঁর পক্ষে হয়তো ভ্যাটিকানের মত ইরাকে বাস করা সম্ভব হত।

সেই সময় ইরাকে সাদ্দাম হুসেনের আটটি প্রাসাদ ছিল। তথ্য অনুসারে সেই আটটি প্রধান প্রাসাদ চত্বরে এক হাজারেরও বেশী ভবন ছিল— বিলাসবহুল প্রাসাদ, অপেক্ষাকৃত ছোট অতিথি নিবাস, কার্যালয়, গুদাম এবং গ্যারেজ— গোটা এলাকার সব মিলিয়ে আয়তন ৩২ বর্গ কিলোমিটার (৭,৯০০ একর)।

ভ্যাটিকানের আয়তন বিস্তৃতি মাত্র ১১০ একর, সাদ্দাম হুসেনের আটটি প্রাসাদ চত্বরের মোট আয়তন ছিল ৭,৯০০ একর। এই কাহিনী থেকে বোঝা যায় নিজের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সাদ্দাম হুসেনের পক্ষে সম্ভব ছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা ত্যাগ করে, তাঁর ঐ বিশাল আটটি প্রাসাদ নিয়ে তিনি বিশ্বের সবথেকে বড় একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে পারতেন। এই মুহূর্তে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা ৮,০০০ একর। সাদ্দাম হুসেন যদি রাজনৈতিক থেকে শান্তিপূর্ণভাবে তাঁর চিন্তনের অভিমুখ পাল্টাতে পারতেন, তাহলে তিনি ৭৯০০ একর এলাকা জুড়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতেন। সেটি বিশ্বের বৃহত্তম শিক্ষাকেন্দ্রগুলির অন্যতম হয়ে উঠতে পারত।

রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি সাদ্দাম হুসেনের আসক্তি এত তীব্র ছিল যে তিনি তাঁর সামনে থাকা অরাজনৈতিক সম্ভাবনাগুলির গুরুত্ব বুঝে উঠতে পারেননি। বর্তমান সময়ের সমস্ত মুসলমান নেতাদের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য - তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতা বিষয়ে অবাস্তব রকমের মোহগ্রস্ত। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে, সেই কারণে তাঁরা এর মাধ্যমে নিজেদের লক্ষ্যপূরণে সক্ষম হননি। যখন তাঁরা নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁরা প্রচণ্ড হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন; মানুষ যখন প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন অবধারিতভাবে এইরকমই ঘটে থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রূপে ২০শে জানুয়ারি, ২০০৯ তারিখে বারাক ওবামা হোয়াইট হাউস ভবনে প্রবেশ করেন। ২০১২-র নভেম্বর মাসে তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হন এবং ২০শে জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে দ্বিতীয়বারের জন্য রাষ্ট্রপতিরূপে শপথ গ্রহণ করেন।

তাঁর কার্যকালের প্রথমদিকে আমেরিকায় বিভিন্ন পরিবর্তন সূচিত করার বিষয়ে তিনি আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু উপর্যুপরি দুটি কার্যকাল অতিবাহিত করার পরেও তিনি তাঁর দেশে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারেননি। ১৮ই জুন, ২০১৫ সালের একটি বক্তৃতায় তিনি বিষয়টি স্বীকার করেন:

'আমি হতাশ, এবং আমার হতাশ হওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, কারণ কংগ্রেসের যে ভাবে কাজ করা উচিত, তারা তা করে না। বহু বিষয়ে কোনো আলোচনা হয় না। কোনো কাজ করার থেকে লোকেরা নিজেদের রাজনৈতিক নম্বর বাড়াতে ব্যস্ত- বিষয় এটা নয় যে কংগ্রেসের কোনো সদস্য মানুষ হিসাবে মন্দ - সেখানে বহু ভালো, উপকারী ও পরিশ্রমী মানুষ আছেন - কিন্তু এই ব্যবস্থার মধ্যে যে সমস্ত উৎসাহব্যঞ্জক উপাদানের ধারণা ঢুকে গিয়েছে তার ফলে পুরস্কার স্বল্পমেয়াদী, মেরুকরণের রাজনীতি পুরস্কৃত হয়, সত্য অপেক্ষা সরলীকৃত বিষয় পুরস্কৃত হয়, বিভাজন পুরস্কৃত হয়। এবং আমি যতই প্রবলভাবে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে থাকি না কেন, সেটি এখনও বিভক্ত।[১]

এই বক্তব্যের মধ্যে অস্থির কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত সেই সমস্ত মুসলমানদের জন্য একটি অতি বড় শিক্ষা আছে, যাঁরা একই অবাস্তব ল্যক্ষ্যর জন্য যুদ্ধ করছেন; অর্থাৎ, রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে পরিবর্তন সাধন। প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক নেতাই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিষয় মোহান্ধ। তাঁরা পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাস আমাদের বলে যে এটি রাজনৈতিক ক্ষমতার থেকে অতিরঞ্জিত আশা কারণ, এই নেতারা যখন রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন করেছেন, তখনও তাঁরা কোনো যথার্থ পরির্বতন সাধন করতে পারেন নি।

ইতিহাস প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক কর্মকান্ডের দ্বারা কেউ কোনো পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে নি। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, অরাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের মাধ্যমে আসল পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় সাদ্দাম হুসেন *'উম্ম্‌ আলমা'-আরিক'* (সমস্ত যুদ্ধের মাতৃরূপিণী যুদ্ধ) বিশেষণটি ব্যবহার করেন। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রমাণিত হয় । বিপরীতে, যদি সাদ্দাম হুসেন তাঁর আটটি প্রাসাদকে শিক্ষাঙ্গনে পরিণত করে দিতেন, হয়ত তাঁর শান্তিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটি আজও বেঁচে থাকত।

ইতিহাস আমাদের বলে যে যুদ্ধ একটি শিকড়হীন বৃক্ষের মত। কোনো ঝড় তাকে সমূলে উৎপাটিত করে দিতে পারে। কিন্তু একটি শান্তিপূর্ণ পরিকল্পনা এমন একটি বৃক্ষের মত, যে বৃক্ষ তার নিজের শক্তিশালী শিকড়ের উপর ভিত্তি করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কোনো ঝড় তার ক্ষতি করতে পারে না ।

ইতিহাসে কোনো যুদ্ধ পরিকল্পনা সাফল্যের শিরোপা লাভ করে নি। অপরদিকে, শান্তিপূর্ণ পরিকল্পনা সর্বদাই সাফল্যলাভ করেছে। ইতিহাসের এই অভিজ্ঞতা থেকে যাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করেন না, তাঁরা এমন একটি পথ নির্বাচন করছেন যা অতীতেও সফল

হয় নি, ভবিষ্যতেও কখনও সফল হবে না। যুদ্ধ পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য, শান্তি পরিকল্পনা অবশ্যই সাফল্য নিয়ে আসবে।

বর্তমান যুগে সমস্ত মুসলমান নেতার কাহিনীই সাদ্দাম হুসেনের মত। যা কিছু সম্পদ পাওয়া যাচ্ছিল, তা ব্যবহার করে তাঁদের প্রত্যেকের সামনে বড় বা ছোট শান্তিপূর্ণ সাম্রাজ্য গড়ে তোলার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাঁরা সকলেই সহিংসতার পথে গেলেন। এইভাবে তাঁরা নিজেদের এবং অন্যদের ধ্বংস করে ফেললেন।

একবিংশ শতাব্দীতে সমস্ত সহিংস কার্যধারাকে শেষ করে শান্তির পথে চলবার জন্য নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করার সময় হয়েছে। যাঁরা হিংসার পথ অবলম্বন করবেন তাঁদের ব্যর্থতা প্রমাণ করবে যে তাঁরা অতীত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করার বিষয়ে উৎসুক ছিলেন না।

আত্মসপক্ষীয় কর্মকাণ্ড, আত্মবিরোধী কর্মকাণ্ড

সুপরিচিত ভারতীয় চলচ্চিত্রাভিনেত্রী প্রিয়াংকা চোপড়া তাঁর নিজের সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেনঃ

'আমি সারাজীবন বিভিন্ন মানুষ সাজার চাপে কাটিয়েছি, তার ফলে আমি আমার সেই 'আসল আমি' কে চিনি না।'[১] বর্তমান যুগ পেশাদারিত্বের যুগ। একটি পেশায় থাকার অর্থ, অন্যদের জন্য জীবনপাত করা। অতএব, এ কথা সকলের জন্য সত্য যে সে অন্যদের জন বাঁচে এবং নিজেকে প্রায় চেনেই না। যেমন, চলচ্চিত্রভিনেতারা তাদের দর্শকদের জন্য বাঁচে, ব্যবসায়ীরা তাদের ক্রেতাদের জন্য, উকিলরা তাদের মক্কেলদের জন্য, রাজনীতিকরা তাদের ভোটারদের জন্য, কর্মচারীরা নিজেদের কোম্পানির উচ্চ আধিকারিকদের জন্য, ইত্যাদি।

এই কারণেই বহু মানুষ আজ যা কাজ করেন, তার সঙ্গে তাঁদের 'আত্মা'-এর কোনো সম্পর্ক নেই ('নন-সেল্ফ অ্যাক্টর'), অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের জন্য নয়, অন্যদের জন্যই বাঁচেন। এটি অবশ্যই ব্যক্তির জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ, এর ফলেই সেই ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে অসচেতন থাকে। সে প্রায়শই অন্যদের মতামত সাপেক্ষে নিজের মূল্যায়নের প্রবণতা প্রকাশ করে, নিজের মতামত অনুসারে নয়। তার ফলে তার নিজের ক্ষমতা যথার্থ প্রকাশিত হতে পায় না, এবং শেষ পর্যন্ত এমনই এক অজ্ঞতার অবস্থায় সেই ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে।

যারা বর্তমান সময়ে সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত, তারা এক্ষেত্রে সবথেকে খারাপ উদাহরণ। এই ধরনের মানুষরা বোমা, বন্দুকের সংস্কৃতিতে জড়িয়ে আছে। তাদের উদাহরণগুলি আত্মবিরোধী কর্মকাণ্ডের উদাহরণ।

আত্মবিরোধী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকারী কারা ? তারা সেই সমস্ত ব্যক্তি, যারা শত্রুকে বিনাশ করার নামে আসলে নিজেদের 'আত্ম'-এর সঙ্গেই যুদ্ধে রত - কখনও তা মনস্তাত্ত্বিক হত্যা অর্থে, আবার কখনও বা যথার্থ শারীরিক ভাবেই হত্যার অর্থে।

যদি কেউ গাছের উপর বসে থাকা পাখির দিকে তাকায়, তাহলে সে উপলব্ধি করবে যে পাখিটি একটি অনবদ্য সৃষ্টির উদাহরণ, স্রষ্টা কতখানি ধী-সহযোগে পাখিটি তৈরী করেছেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে স্রষ্টা পাখিটিকে অস্তিত্ব প্রদান করেছেন পাখিটির পরিকল্পনা সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। সব সময়েই, পাখিটি তার সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য ছিল, তা পূরণে রত থাকে। মানুষের অবস্থা পাখির তুলনায় লক্ষ কোটি গুণে ভালো। তার গুণমান অনুসারে, মানুষ এই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পরিকল্পিত প্রাণী। মানুষের ব্যক্তিত্বের এই দিকটি আমাদের বোঝায় যে এত গুণে সুসজ্জিত হওয়ার কারণে, কোনো উচ্চতর উদ্দেশ্যে তার সৃষ্টি করা হয়েছিল। তা হলে, মানুষের প্রথম কাজ নিজেকে আবিষ্কার করে তদনুসারে নিজের জীবন পরিকল্পনা করা।

সহিংসতা বা সন্ত্রাস, মানুষের জন্য ঈশ্বরের সৃষ্টি পরিকল্পনাকে অস্বীকার করে। সহিংসতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ এই যে, নিজের ক্ষমতার যথাযথ সদ্ব্যবহার না করে, কোনো মানুষ যে কাজ করছে তা ক্রমে তার নিজের এবং অন্যদের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠবে। সেই কারণে,যারা হত্যার সংস্কৃতি গ্রহণ করে, বলা হয়ে থাকে যে তারা 'আত্মবিরোধী কর্মকাণ্ডের' সঙ্গে যুক্ত।

যদি এর ভিত্তিতে মানুষকে বিচার করতে হয়, তাহলে তাদের তিনভাগে ভাগ করা যায়: কর্মকাণ্ডে আত্মবিরোধী অংশগ্রহণকারী, আত্মসম্পর্কহীন অংশগ্রহণকারী এবং কোনো কর্মকাণ্ডে আত্মসপক্ষীয় অংশগ্রহণকারী। সমস্ত মানুষই এর কোনো না কোনো ধারার মধ্যে পড়ে।

সন্ত্রাসবাদী বা সহিংস কর্মকাণ্ডে যুক্ত ব্যক্তিরা আত্মবিরোধী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত, অর্থাৎ তারা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের ধ্বংস করতে প্রস্তুত। যদি কারো বন্ধু তাকে একটা উচ্চমানের চলভাষ যন্ত্র উপহার দেয়,তাহলে সে নিশ্চয় সেটা ফেলে দেবে না, বা টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলবে না। কেউ কারো উপহারের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করে না। মানুষের অস্তিত্বও ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি উপহার।

কিন্তু যে সমস্ত মানুষ সহিংস কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়, তারা ঈশ্বরের উপহারের অপব্যবহার করে - তারা সঠিক উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহার করার পরিবর্তে তার ধ্বংসসাধন করে।

অংশগ্রহণকারীরা দ্বিতীয় শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত। ঈশ্বর তাদের যে ক্ষমতা দিয়েছেন, এই পর্যায়ের মানুষেরা নিদারুণভাবে তার কম ব্যবহার করে ঈশ্বরের দেওয়া মহার্ঘ উপহারটির যে অপব্যবহার করে, সেটি অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

যে সমস্ত মানুষরা তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত, অর্থাৎ যাঁরা কোনো কর্মকাণ্ডে আত্মসপক্ষীয় অংশগ্রহণকারী,তাঁরা স্রষ্টার সৃষ্টি পরিকল্পনা অনুসারে নিজেদের ভূমিকা পালন করেন। এই সমস্ত মানুষরা নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যে পৃথিবীতে বাস করেন তার আবিষ্কার করতে থাকেন। নিরন্তর পাঠ এবং ভাবনাচিন্তার মধ্য দিয়ে তাঁরা উচ্চতর বাস্তবগলি বোঝার চেষ্টা করেন এবং তারপর স্রষ্টা যে উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য নিজেদের সঠিকভাবে তৈরী করতে থাকেন।

এই শেষক্ত পর্যায়ের ব্যক্তিরাই যথার্থ মানুষ। তারা দৈব বিন্যাস অনুসারেই নিজেদের পরিকল্পনা করে। তারা নিজেদের সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করে নিজেদের উন্নতি ঘটায়। এই সমস্ত মানুষ স্রষ্টার নির্দিষ্ট মান অনুসারে নিজেদের উপযুক্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করে। এরাই জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে অনন্ত আশীর্বাদ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তারা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের মহীরূহ রূপে বিকশিত হবে এবং এর পরবর্তী জগতে তারা ঈশ্বরের উদ্যানের সুন্দর অংশ হয়ে উঠবে।

আমি একজন মানুষকে চিনি যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়নি। অতএব, একটি সাধারণ চাকরি করেই তাকে জীবিকানির্বাহ করতে হত। সে মাঝেমধ্যেই গভীর অনুতাপের সঙ্গে তার এক বন্ধুকে বলত, ‘মানুষ একবারই মাত্র জীবনের উপহার ভোগ করে।’

অর্থাৎ, জীবন ঈশ্বরের দেওয়া একটি মূল্যবান উপহার। সকলের উচিত তার সদ্ব্যবহার করা, কারণ এই উপহার আর একবার পাওয়া যাবে না। মৃত্যুর পরে কেবল অনুশোচনা পড়ে থাকবে, কারণ মৃত্যু জীবনের এমন এক বিন্দু যেখান থেকে ফেরার কোনো পথ নেই।

এই ফর্মুলা বা নীতি তাদের জন্য আরো বেশি করে প্রযোজ্য যারা সহিংস কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত।

এই সমস্ত মানুষরা হিংসার সংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়ে এবং অচিরে বহু মানুষকে হত্যা করার পরে নিজেরাও নিহত হয়। ঈশ্বর তাদের যে সমস্ত মূল্যবান সুযোগ দিয়েছিলেন তারা সেগুলির সদ্ব্যবহার করে নি, অন্যদেরও করতে দেয় নি।

মৃত্যুর পরে এই সমস্ত মানুষরা উপলব্ধি করবে যে ঈশ্বর তাদের ‘জীবন’ নামক এক সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা কোনো উচ্চতর উদ্দেশ্যে তার প্রয়োগ না ঘটিয়ে নিজেদের জীবন শেষ করেছে। ফলে, সমস্ত অনন্ত জুড়ে এক গভীর অনুশোচনা ছাড়া তাদের জন্য আর কিছুই পড়ে থাকে না।

এই অবস্থাটি ভীতিপ্রদ এবং তার সম্যক স্বরূপ অনুধাবন করলে সন্ত্রাসবাদীদের কাছে এই সতর্কীকরণ পৌঁছে যাওয়া উচিত যে অবিলম্বে সমস্ত সহিংসতা ত্যাগ করে জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে রত হতে হবে।

সন্ত্রাসের সংস্কৃতি

আগেকারকালে সন্ত্রাসের সংস্কৃতি এত ব্যাপক ছিল না এবং যুদ্ধাস্ত্র তৈরী হত সীমিত সংখ্যায়। সাধারণভাবে তা তৈরী হত কেবলমাত্র রাজারাজড়াদের জন্য, যাঁরা যুদ্ধে সেগুলির ব্যবহার করতেন। সন্ত্রাসের সংস্কৃতি একটি সাম্প্রতিক ঘটনা ; এর প্রচলন হয়েছে যবে থেকে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ শিল্পে একটি প্রধান উদ্যোগ লক্ষ্য করা গিয়েছে, যার ফলে যুদ্ধাস্ত্রগুলি সহজলভ্য বস্তুসমূহের তালিকাভুক্ত হয়েছে।

একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে, যারা নরনিধনের জন্য এই ভয়ংকর মারণাস্ত্রগুলি তৈরী করে, জীবনের শেষদিকে তারা গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তারা সকলে নিজেদের প্রশ্ন করতে থাকে যে কেন তারা ঐ রকম ভয়ানক অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এদের অধিকাংশের কাছেই মৃত্যুর আগেও এই প্রশ্নের উত্তর মেলে না।

রুশ অস্ত্রনির্মাণকারী, মিখাইল কালাশ্‌নিকভ (১৯১১-২০১৩) এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। একে-৪৭ রাইফেলটির নির্মাণের কারণে তিনি সর্বাধিক পরিচিত - তাঁর নামানুসারে এটি নামাংকিত করা হয়েছিল। এই কালাশ্‌নিকভ বা একে-৪৭ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সুপরিচিত ও জনপ্রিয় যুদ্ধাস্ত্র। মনে করা হয় যে বিশ্বজুড়ে দশ কোটিরও বেশি কালাশ্‌নিকভ রাইফেল বিক্রি করা হয়েছে।

তাঁর মৃত্যুর ছ'মাস আগে, কালাশ্‌নিকভ রুশ অর্থোডক্স চার্চের প্রধান প্যাট্রিয়ার্ক কিরিলের কাছে তাঁর উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করে একটি চিঠি লেখেন। ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে এটি রুশ দৈনিক সংবাদপত্র 'ইজভেস্তিয়া'-য় এটি প্রকাশিত হয়। চিঠিতে কালাশ্‌নিকভ জানান যে তিনি 'অসহ্য আধ্যাত্মিক যন্ত্রণা' ভোগ করছেন এই ভেবে, যে তাঁর সৃষ্ট যন্ত্রটির দ্বারা যতগুলি হত্যা সাধিত হয়েছে, সেগুলির জন্য তিনি দায়ী। 'আমার কাছে সেই উত্তরহীন প্রশ্নটি নিরন্তর রয়েছে ঃ আমার রাইফেল যদি মানুষের প্রাণ নিয়ে থাকে, তাহলে কি একথা ঠিক, যে আমি - একজন খৃষ্টান এবং অর্থোডক্স সদস্য রূপে, বিশ্বাসী হিসাবে সেই সমস্ত মৃত্যুগুলোর জন্য দায়ী?' তিনি প্রশ্ন করেন।

তিনি আরো লেখেন, ‘আমি যত বেশি দিন বাঁচি, প্রতিদিন আরো বেশি করে এই প্রশ্ন আমার মাথায় গেঁথে যায় এবং আমি আরো বেশি করে চিন্তা করতে থাকি যে ঈশ্বর কেন মানুষের মধ্যে ঈর্ষা, লোভ ও আগ্রাসনের শয়তানি আকাঙ্ক্ষাগুলি গড়ে উঠতে দিয়েছিলেন।[১]

সন্ত্রাসবাদীদের জন্যও একথা সত্য। সন্ত্রাসবাদ শুরু হয় তীব্র ঘৃণা দিয়ে এবং গভীর অনুশোচনায় এর পরিসমাপ্তি। তাদের আক্রমণ ঘটে যাওয়ার পরে যদি আত্মঘাতী বোমারুদের প্রশ্ন করার সুযোগ পাওয়া যেত, তারা নিশ্চয় স্বীকার করত যে তারা অতি ঘৃণ্য অপরাধ সংঘটিত করেছে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা আর তাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাই না।

কিন্তু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত কিছু মানুষের উদাহরণ আমাদের কাছে আছে। এঁরা মারা যাননি, কিন্তু গভীর অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছেন। লী বয়েড মালভো (জন্ম, ১৯৮৫), একজন জামাইকান-আমেরিকান দণ্ডিত, সাজাপ্রাপ্ত খুনী। সে জন অ্যালেন মুহাম্মদ নামক আরেক ব্যক্তির সঙ্গে মিলে ওয়াশিংটন মেট্রোপলিটান এলাকায় ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে তিন সপ্তাহ ব্যাপী বেল্টওয়ে স্নাইপার আক্রমণের হত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়। সি এন এনকে লেখা একটি চিঠিতে মালভো জানায় যে সে তখনও ‘অপরাধবোধে, লজ্জায়, অনুতাপে ও নিজের সেরে ওঠা বিষয়ে জর্জরিত, যদি তা আদৌ কখনও সম্ভব হয়।’ এবং এই পর্যায়ে মালভোর সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করতে থাকা এক সমাজকর্মী আমাদের জানান যে মালভো প্রায়শই আত্মপ্রতিকৃতি আঁকে ; সেই আত্মপ্রতিকৃতির অনেকগুলির মধ্যে দেখা যায় যে তার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।[২]

সন্ত্রাসবাদ সর্বদাই অনুশোচনায় শেষ হয়। সন্ত্রাসবাদের একটি আত্ম-নিবৃত্তকারী বৈশিষ্ট্য আছে। অর্থাৎ, একটি সন্ত্রাসবাদী কর্মে লিপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই সেই জঙ্গী বুঝতে পারে যে সে ভুল করেছে। এই কারণে, সন্ত্রাসবাদের সমাপ্তি ঘটা উচিত। কিন্তু সমস্ত সম্ভাব্য সন্ত্রাসবাদীরা এইভাবে চিন্তা করে না; তাদের মধ্যে নিতান্ত অল্পসংখ্যকই শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য সহিংসতার পথ ত্যাগ করতে রাজি হবে।

উগ্রপন্থীরা যে কাজ করতে যায়, সেই কর্ম বিষয়ে তারা যথেষ্ট চিন্তা করে না বলে আজও সন্ত্রাসবাদ বেঁচে আছে। যদি এই সন্ত্রাসবাদীরা তাদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের কী ফল হবে, তা আগে উপলব্ধি করতে পারত, তাহলে তারা কখনই এই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করত না। তারা তাদের বোমা-বন্দুক ছেড়ে দিয়ে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করত।

সন্ত্রাসবাদ একটি অস্বাভাবিক কর্ম। যুক্তি বা বিবেক, কোথাও থেকেই সন্ত্রাসের সমর্থন পাওয়া যায়না। কিন্তু প্রায়শ মানুষ আবেগের বশে সন্ত্রাসবাদী কর্ম সম্পাদন করে। এক্ষেত্রে শিক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক, একটি নিবৃত্তকারী উপাদানের কাজ করতে পারে। আমরা শিক্ষিত সন্ত্রাসবাদীদের কথা শুনতে পাই কিন্তু তাদের শিক্ষা কারিগরী বা পেশাগত স্তরে সীমাবদ্ধ ; শিক্ষার বৃহত্তর অর্থ থেকে তারা বঞ্চিত। বর্তমান সময়ের সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করতে হলে বন্দুকের থেকে শিক্ষা অনেক বেশি কার্যকরী। একথা সত্য যে 'শান্তিবোমা' রক্তক্ষয়ী হিংস্র বোমার থেকে অনেক বেশি কার্যকরী।

একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

আমি নিরামিষাশী এবং আজন্ম শান্তিবাদী। আমার জীবন খুবই ঘটনাবহুল এবং আমার জীবনের প্রতিটি প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ঘটনা,আমার শান্তিপ্রিয় প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

এখানে আমি আমার জীবনের একটি ঘটনা বলতে চাই ; এটি আমার পরিষ্কার মনে আছে। ১৯৮৪ সালে আমি আমার অগ্রজ এ এ খানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি এলাহাবাদে থাকতেন। তাঁর আগ্রহের বিষয়গুলি আমার থেকে একেবারেই আলাদা ছিল। তাঁর নিজের দুটো লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক ছিল এবং তিনি মাঝেমধ্যে শিকারে বেরোতেন। আমি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তিনি এরকম একটি শিকার অভিযান করেন এবং আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেন। সঙ্গে তাঁর অন্য বন্ধুরাও ছিল। যদিও শিকার বিষয়টি একেবারেই আমার মানসিকতার সঙ্গে যায়না, অগ্রজের চাপে পড়ে আমি রাজি হয়ে গেলাম।

দুটো মোটরগাড়ি ভর্তি করে আমরা এলাহাবাদের বাইরের দিকে পৌঁছলাম। সেখানকার পরিবেশ ছিল জঙ্গলের মত এবং গাছগুলির উপরে অনেক পাখি বসে ছিল। আমার দাদা শিকার করার জন্য এক ধরনের পায়রা খুঁজছিলেন, স্থানীয়ভাষায় তাদের কাহ্লাক বলা হয়। তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা শিকার করতে গেলেন, আমি অনিচ্ছুক দর্শকের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

তখন আমার দাদা আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার হাতে একটা বারো- বোরের বন্দুক ধরিয়ে দিলেন এবং একটি কাহ্লাক-এর দিকে তাক করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আমি ডালে বসা একটা কাহ্লাক দেখতে পেলাম। আমি আমার ঘাড়ে বন্দুক রেখে নিশানা ঠিক করতে শুরু করলাম। পাখিটা যখন সম্পূর্ণ আমার আয়ত্তের মধ্যে, কেবল ট্রিগার টেপা বাকি, আমার মনে হঠাৎ একটা প্রশ্ন এল ঃ আমি এই পাখিটাকে কেন মারছি? আমার বিবেক উত্তর দিলো যে পাখিটাকে মারার কোনো অধিকার আমার নেই। আমি যখন এটা উপলব্ধি করলাম, আমি আর ট্রিগার টিপতে পারলাম না এবং আমার দাদাকে বন্দুকটি ফেরৎ দিয়ে দিলাম। এই ঘটনা

আমাকে এত বিচলিত করেছিল যে আমি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করে একটি বাস ধরে একা এলাহাবাদে ফিরে আসি।

হিংসার সংস্কৃতি স্বভাবতই অন্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত। কিন্তু আসলে এটি বাস্তবতা বিরোধী। যখন কোনো হিংস্র ব্যক্তি আরেকজন মানুষকে মারবার চেষ্টা করে সে কঠিন বাস্তবটি সম্পর্কে অবহিত থাকে না। বাস্তবটি এই যে স্বয়ং মৃত্যুদূত সেই সময় তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে। সে যখন অন্যদের হত্যা করে, তখন আগে অথবা পরে, সেও মৃত্যুদূতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। মৃত্যুদূত তাকেও ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাবে সেখানে তাকে তার যাবতীয় কর্মের জন্য হিসেব দিতে হবে। বন্দুকধারী প্রতিটি মানুষ যদি এই বাস্তবটি মনে রাখত তাহলে কোনো কারণেই সে বন্দুকটি অন্যের দিকে তাক করতে পারত না। জীবনের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সে কেবল শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে নিয়োজিত থাকত।

আমি যখনই সন্ত্রাসবাদের কোনো খবর শুনি, আমার এলাহাবাদের ঐ অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে যায়। আমি ভাবি যে সন্ত্রাসবাদীরাও তো আমার মতই মানুষ। তাদেরও আমার মত একই বিবেক আছে; সেই বিবেক কি তাদের একবারও প্রশ্ন করে না যে কেন তারা অন্য মানুষদের হত্যা করছে? প্রথমত তাদের যখন প্রাণদানের ক্ষমতা নেই, সেখানে তারা প্রাণনাশের ক্ষমতা পায় কোথা থেকে? তারা তো চায় না কেউ তাদের হত্যা করুক; তাহলে তারা এই অপরাধ অন্যদের উপর করছে কি ভাবে? সন্ত্রাসবাদীরা কি পাথর দিয়ে তৈরী? পাখি মারবার জন্য আমার হাতে যে বন্দুক দেওয়া হয়েছিল সেটি যেমন আমার হাত থেকে পড়ে যায়, তেমনি সন্ত্রাসবাদীরা যখন অন্য মানুষদের মারতে উদ্যত হয়, তাদের হাত থেকে বন্দুক খসে পড়ে না কেন?

এই ভাবনাটি আমাকে খুব বিচলিত করে। আমার উপলব্ধি এই যে সন্ত্রাসবাদীরা নেতিবাচক হয়ে উঠেছে কারণ বিভিন্ন ঘটনার একপাক্ষিক মূল্যায়ন তাদের কাজের ভিত্তি হয়। যেমন, একটি সংবাদ প্রতিবেদন থেকে আমরা সন্ত্রাসবাদীদের একটি পাঠ্যসূচী পাই; বইগুলির অধিকাংশই যুদ্ধ বিষয়ক।

ওসামা বিন লাদেনের অ্যাবটাবাদ চত্বর থেকে পাওয়া কাগজপত্রের সংগ্রহও এই বিষয়টি পরিষ্কার করে তোলে। বিন লাদেন এবং তার লোকেরা এগুলিই পড়ছিল। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য : মিশেল চসুদভস্কির *অ্যামেরিকা'স ওয়ার অন টেররিজম* (সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ), জেমস ক্র্যাবট্রির লেখা *গেরিলা এয়ার ডিফেন্স ঃ* অ্যান্টিএয়ারক্রাফ্‌ট ওয়েপনস অ্যাণ্ড টেকনিক্স ফর *গেরিলা ফোর্সেস*, *বব* উডওয়ার্ডের *লেখা ওবামা'স ওয়ার্স* (ওবামার যুদ্ধগুলি), রবার্ট হপকিন্স মিলারের লেখা *দি ইউ এস*

অ্যাণ্ড ভিয়েতনাম ১৭৮৭-১৯৪১ এবং ফ্রিৎজ স্প্রিং মায়ারের *ব্লাডলাইনস অব দি ইলিউমিনাটি*।[১]

এর থেকে বোঝা যায় যে সন্ত্রাসবাদীরা অন্যদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব দ্বারা পরিচালিত ও নির্ধারিত। সম্ভবত তারা অন্য মানুষদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায় না, যারা তাদের মনে অন্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যদি সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সেই রকম মানুষদের সাক্ষাৎ হত, আমি নিশ্চিত যে সন্ত্রাসবাদীরা তাদের দর্শন বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করত এবং তাদের সহিংস সংস্কৃতি ত্যাগ করত। একবার তাদের বিবেক জাগলে তারা নিশ্চয় আমার মতই বন্দুক ত্যাগ করত।

এইরকম অভিজ্ঞতা আমার আরো হয়েছে। যেমন, ১৯৯৩ সালে একটি উগ্রপন্থী সংগঠন তাদের খতম-তালিকায় আমার নাম রেখেছিল। সেইসময় একদিন আমার নতুন দিল্লির অফিসে হঠাৎ এক অপরিচিত তরুণের আবির্ভাব হয় ; অফিসে আমি তখন একা ; আমি ধরেই নিয়েছিলাম তার পকেটে রিভলভার আছে, সে কোনো সময় পকেট থেকে হাতটা বের করছিল না। আমি একমুহূর্ত ভাবলাম; তারপর, তার কাছে গিয়ে, তার পাশে বসে তার মাথায় হাত রাখলাম। বললাম, 'দেখো, আমি তোমার বাবার মত। আমার পরামর্শ হচ্ছে তুমি কোন স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে যাও। আমি কথা দিচ্ছি তোমার লেখাপড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত সমস্ত খরচ আমি বহন করব।' তরুণটি চুপ করে রইল, তারপর ধীরে ধীরে উঠে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল।

আমার শান্তিবিষয়ক লেখাগুলি বহু তরুণ পড়েছে এবং সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তারপর তারা একটি শান্তিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সন্ত্রাসবাদীরা তো প্রাথমিকভাবে দুর্নীতিপূর্ণ ব্যক্তি নয়। তাদের মার্গ নির্দেশ-নির্ধারণ ভুল। আমাদের উচিত যুক্তি সহকারে তাদের চিন্তন পরিবর্তনের চেষ্টা করা, তাহলে নিঃসন্দেহে সন্ত্রাসবাদ অর্ন্তহিত হবে।

সপ্তম অধ্যায়
ইসলাম ও শান্তি

শান্তির ধর্ম ইসলাম

ইসলামের দুটি প্রাথমিক শিক্ষা হল ঃ একেশ্বরবাদ এবং শান্তি। তৌহিদ (একেশ্বরবাদ) ইসলামের প্রাথমিক আদর্শ। এটিই ইসলামের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সমস্ত কাজের উৎস। এই একেশ্বরবাদের বাস্তবসম্মত ব্যবহারিক ধারা হল শান্তি। শান্তি একটি স্বাভাবিক পরিবেশের ভিত্তি, যে পরিবেশে ইসলামের আদর্শগত ও বাস্তবসম্মত ব্যবহারিক শিক্ষাগুলি ক্রিয়াশীল হতে পারে।

কোরান পড়লে আমরা দেখতে পাই যে বর্তমান জগত নিয়ে নয়, তার পরের জগৎটি সম্পর্কে কোরানের সবথেকে বেশি চিন্তা। কারণ, এই জগৎটি মানুষের জীবনে একটি অল্পকালস্থায়ী পর্ব, এবং এর পরের জগৎটি অনন্ত। কোরানের ধারনা অনুসারে, এই জগতের জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন কিন্তু সেই পরবর্তী জগৎটির জন্য তৈরী হওয়াটাই লক্ষ্য। যাঁরা ইসলামিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত তাঁদের মনোযোগ সম্পূর্ণভাবে পরলোক ও স্বর্গের প্রতি চলে যায়।

ক্রমশ এটি স্বাভাবিক যে, যে সমস্ত বিষয় যেমন লোভ, ঘৃণা, শত্রুতা, সহিংসতা ইত্যাদি, যেগুলি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়, তার সবগুলিই গুরুত্ব হারিয়ে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এইভাবে যেখানে যথার্থ ইসলামি সংস্কৃতি বিরাজ করে সেখানে যুদ্ধের এই কারণগুলির কোনো অস্তিত্ব থাকে না। তাদের নিজেদের স্বার্থে মানুষ শান্তিপূর্ণ নাগরিক হিসেবে সমাজে বাস করবে।

সমগ্র ইতিহাস জুড়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভ বারবার যুদ্ধের কারণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু ইসলাম এই নীতি প্রবর্তন করেছিল যে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতেই যে কোন শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠবে। এই আদেশ কোরানে উল্লিখিত হয়েছে ঃ আমরুহুম শুরা বায়নাহুম। অর্থাৎ, ‘পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করা হয়’ (৪২ঃ৩৮)।

এর অর্থ এই যে ইসলামে কোনো শাসনব্যবস্থা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়না, এটি সমাজের ভিতর থেকেই গড়ে ওঠে। এটি বাইরে থেকে কারো চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়। এ কথাটি একটি হাদিসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ

'তোমরা যেমন, তোমাদের শাসকরাও তেমনই হবে।'[১] বিরোধীদের ক্ষমতাচ্যুত করে সমাজ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর শাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টার ফলেই রাজনৈতিক ক্ষমতার নামে যুদ্ধ ঘটে থাকে। বিরোধীদের ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্য থেকেই দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। কিন্তু যখন এই নীতি গ্রহণ করা হয় যে রাজনৈতিক শাসন কোনো আরোপিত বিষয় নয়, সমাজের ভিতর থেকেই এর উদ্ভব হয়, তখন যুদ্ধের কারণগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই দূরীকৃত হয়।

রাজনীতি কোন গতিপথ গ্রহণ করবে এই বিষয়ে যদি কারো কোন ধারণা থাকে, তাহলে তার কাছে একটিই পছন্দের সুযোগ থাকে, এবং সেটি হল, শান্তিপূর্ণভাবে নিজের ভাবনাগুলি ছড়িয়ে দেওয়া। অন্যদের চিন্তনের উপর নিজের চিন্তন বলপূর্বক আরোপ করা অপেক্ষা, ব্যক্তিকে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সমাজ স্বেচ্ছায় সেই চিন্তন গ্রহণ করছে। রাজনৈতিক চিন্তনগুলি বলপূর্বক আরোপ করার ব্যাপারে আজ কারো জন্যই সুযোগ নেই।

এইরকম বেশ কিছু ধারা আছে, যেগুলি মানুষকে তাদের শাসকদের সঙ্গে কোনোরকম বিরোধের সম্ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত করে। যদি শাসকদের বিরুদ্ধে তাদের কোনো অভিযোগ থাকে, তাদের কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করা উচিত। রাজনীতির পরিবর্তে তাদের উচিত অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজেদের মনোনিবেশ করা। হাদিস গ্রন্থগুলিতে *কিতাব আল-ফিতান* শিরোনামে এইরকম অনেক ধারা লিপিবদ্ধ আছে। এই বিষয়ে আল-ইমাম আল-নবাবি এইভাবে আলিমদের (উলেমা-র) মতামত বর্ণনা করেছেনঃ

'সমকালীন শাসককে কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ *(খুরুজ)* এবং যুদ্ধ *(কিতল)* বিষয়ে বলা যেতে পারে যে আলিমদের *(উলেমা-র)* সর্বসম্মতিক্রমে এগুলি আইনবিরুদ্ধ *(হারাম)*, যদি বা কেউ মনে করেন শাসক দুর্নীতিপরায়ণ *(ফাসিক)* এবং শোষণকারী *(জালিম)*'।[২]

এই নীতির অর্থ রাজনীতি পরিত্যাগ করা নয়। বরঞ্চ এর মধ্যে বহু বিচক্ষণতা আছে। এর অর্থ এই যে ইসলাম কর্মক্ষেত্রের বিভাজন বিষয়টি স্বীকার করেছে। যদি কোরান পাঠ করা হয়, বিশেষত আল হজ্জ্ব সুরা (অধ্যায়)-র ৪১তম আয়াতটি এবং এই বিষয়ে অন্যান্য আয়াতগুলি পড়া হয়, তাহলে আমরা দেখব যে কোরান জীবনের দুটি ক্ষেত্রকে স্পষ্টত পৃথক করেছে ঃ রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক।কোরানে এই দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে শ্রম বিভাজনের ইঙ্গিত ও পরামর্শ আছে। কোরান অনুসারে, শাসকদলের দায়িত্ব সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ; এবং সংস্কারকদের দায়িত্ব অরাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখা, যেমন শিক্ষা - প্রথাগত

এবং অপ্রথাগত, দাওয়াহ্ কর্ম (মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের বার্তা প্রচার করা), মানুষের মধ্যে সঠিক চিন্তনের প্রসার, ইত্যাদি। এইভাবে দুটি দল একটি অধিকতর ভালো সমাজ গঠনে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে পারে। এইভাবেই সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারবে এবং সংঘাতের কোনো কারণ থাকবে না।

কর্মবিভাজনের এই নীতি সমাজে সংঘাত ও সংঘর্ষের কারণগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ফলে সমাজ শান্তির এক পরিবেশের বরদান লাভ করে, সংঘাতের নয়।

কোরান এবং হাদিসে প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষাটি এবং অনুরূপ অন্যান্য শিক্ষা, সমাজে প্রচলিত যুদ্ধ এবং অন্যান্য রূপ হিংসার অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত। এইভাবে একটি স্বাভাবিক এবং অনুকূল পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইরূপ অবস্থায় সমস্তরকমের স্বাস্থ্যকর এবং সৃজনশীল কাজ সম্ভব হয়।

সত্য এই যে পূর্ণ অর্থে ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম। কোনোভাবেই তা যুদ্ধের ধর্ম নয়। ইসলামে শান্তিই নিয়ম এবং যুদ্ধ একটি বিরল ব্যতিক্রম মাত্র। উপরন্তু পূর্ববর্তী যুগগুলিতে এই ব্যতিক্রম প্রযোজ্য ছিল, যখন পৃথিবীতে উপজাতীয় সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিল। এখনকার যুগ সম্পূর্ণ আলাদা। আজ আমরা গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের যুগে বাস করছি। অতএব 'যুদ্ধ' শব্দটি আন্তর্জাতিক অভিধানে অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছে।

বর্তমানে কোনো যুদ্ধ ঘটলে তা নিখিল-সৃষ্টি ব্যাপী স্বাভাবিকতার বিরোধী।

পারস্পরিক নির্ভরতা ঃ প্রকৃতির একটি নিয়ম

প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, পারস্পরিক নির্ভরতার নীতিই হল মানব জীবনের ভিত্তি। সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে অসাম্য যেন দৃঢ়সংলগ্ন। যদি এর প্রতিটি সদস্য পারস্পরিক নির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা সহ এই অসাম্য এবং পার্থক্যগুলিকে স্বীকার করে নেয়, তাহলে সমাজ শান্তিপূর্ণ এবং সুসংহত থাকতে পারে। কোরানে প্রকৃতির এই নিয়মের উল্লেখ আছে ঃ

'তারা কি তোমাদের ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভাগ করে দেয়? এই পৃথিবীর জীবনে আমরা তাদের জন্য জীবিকা ভাগ করে দিই, এবং কাউকে কাউকে অন্যদের থেকে উচ্চতর অবস্থানে তুলে ধরা হয়, যাতে তারা একে অন্যের বৃত্তির সেবা গ্রহণ করতে পারে; এবং তোমাদের ঈশ্বরের আশীর্বাদ অবশ্যই, তারা যে পরিমাণ সম্পদ জড়ো করতে পারে, তার থেকে অনেক বেশি' (৪৩ঃ৩২)।

কোরানের এই আয়াতটি থেকে স্পষ্ট যে দৈব অনুশাসন অনুসারে মানুষের মধ্যে কোন একরূপত্ব থাকবে না, পার্থক্য থাকবে। এই পার্থক্য গড়ে উঠেছে এক বৃহৎ বুদ্ধিমত্তার উপরে। সেটি এই যে, সব মানুষের জানা প্রয়োজন, স্রষ্টার বিন্যাস অনুসারে এই পৃথিবীতে কোনো মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একজন ব্যক্তি অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র ধরেই নিজেকে সম্পূর্ণ করে তোলে। অন্য কথায় বলতে গেলে, সমাজের প্রতিটি সদস্যকে মেনে নিতে হবে যে পারস্পরিক নির্ভরতা সম্ভাব্য সামাজিক অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য।

এটি প্রয়োজন যে মানুষ এই সমস্ত পার্থক্যকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবে। এই বাস্তবকে স্বীকার করলে সামাজিক অস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে।

পার্থক্য মানবজীবনের একটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য এটি স্বীকার করে মানুষকে মনে রাখতে হবে যে স্রষ্টার সৃষ্টি পরিকল্পনা অনুসারে পৃথিবীর সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটি পারস্পরিক নির্ভরতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। এই সত্যটি স্বীকার করলে সমাজ থেকে সহিংসতা নির্মূল করা সম্ভব।

এই পার্থক্যকে স্বীকার করার অনিচ্ছা হল মানবসমাজের বৈশিষ্ট্য; এর ফলে মানুষদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা বৃদ্ধি পাবে। পৃথিবী থেকে বৈষম্য দূরীকরণের নামে

মানুষ সহিংসতা ও সংঘাতে জড়িয়ে পড়বে। এরফলে সহিংসতার একটি অনন্ত বৃত্তের সৃষ্টি হবে।

কিন্তু যদি মানুষ পার্থক্যকে একটি বাস্তব বলে স্বীকার করে, তাহলে সমাজে সহযোগিতার সংস্কৃতি বৃদ্ধি পাবে। প্রতিটি ব্যক্তি অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাইবে এবং এইভাবে একটি সম্মিলিত সংস্কৃতি প্রেরণা পাবে। সম্মিলিত সহযোগিতার এই সংস্কৃতি সমাজে শান্তি স্থাপনে সহায়ক হবে।

যারা সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত, তারা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়, স্বয়ং স্রষ্টার সৃষ্টি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। ইসলামি ধর্মশাস্ত্রে বহু অনুশাসন আছে, যেগুলি হিংসা নিষিদ্ধ করে। তার কারণ এই যে সহিংসতার সংস্কৃতি দৈব সৃষ্টি পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধী। এই পরিকল্পনা অনুসারে, যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়, অন্যদের মনে করা উচিত যে সেই অবস্থাটি ঈশ্বর-নির্দেশিত এবং তাদের ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য কোনোরূপ প্রচারে যুক্ত হওয়া উচিত নয়।

অন্য কথায় বলতে গেলে, সৃষ্টি পরিকল্পনা স্থিতাবস্থা রক্ষা কামনা করে। স্থিতাবস্থা রক্ষার এই নীতি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র কার্যকরী ফর্মুলা। স্থিতাবস্থায় পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করলে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, প্রচলিত অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে নিজের কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কোনো অভিযোগ থাকে বা কোনোভাবে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়, তাহলে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথেই তাদের কঠোরভাবে স্থির থাকতে হবে। এই বিষয়ে কোনো অজুহাতই গ্রাহ্য হবেনা।

পুরুষ এবং নারীর মধ্যে পার্থক্য ক্ষতিকর নয়; অপর পক্ষে, এটি আশীর্বাদ। যখন মানুষ পরস্পরের পরিপূরক ভূমিকায় থাকে, তখন সহযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে ওঠে - এর ফলে শান্তি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ আরো বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়।

পারস্পরিক নির্ভরতার এই সংস্কৃতি সমস্ত রকম মানবিক মূল্যবোধ বৃদ্ধির সহায়ক হয় এবং সামাজিক প্রকল্প হিসেবে শ্রেষ্ঠতম। যারা সহিংসতার পথ নির্বাচন করেছে, তারা শুধুমাত্র সামাজিক শান্তি ধ্বংস করছে এমন নয়, তারা এমন একটি লক্ষ্য স্থির করেছে, যা অর্জন করা অসম্ভব। পারস্পরিক নির্ভরতা প্রকৃতির নিয়ম। পারস্পরিক নির্ভরতার এই নীতি মেনে নিলে সমাজে শান্তি আসে এবং প্রগতির সমস্ত দরজা খুলে যায়।

ইতিহাসের চূড়ান্ত মন্দ

যুদ্ধ কোনো নতুন ঘটনা নয়। এটি সর্বদাই মানব ইতিহাসের অঙ্গ। মানুষের প্রথম প্রজন্মেই আদমের দুই পুত্রের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়, যার ফলে অ্যাবেল তার ভাই কেইনকে হত্যা করে। সেই সময় থেকে প্রতিটি গোষ্ঠী এবং প্রতিটি দেশে এই যুদ্ধের ধারা অব্যাহত আছে। কিন্তু আমরা ইতিহাস থেকে শিখি যে সংঘর্ষের প্রতিটি পর্বের একটা শেষ আছে। সর্বদাই এর একটা সীমিত পরিধি থাকে। পৃথিবীতে এমন কোনো যুদ্ধ নেই যা অনির্দিষ্টকালের জন্য ঘটেছে ; এমন কি প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দুটিও সীমিত কালের জন্য ঘটেছিল।

কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের বিষয়টি যেন সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা ইতিহাস থেকে দেখি যে মুসলমান 'উম্মা'-য় কোনো যুদ্ধ শুরু হলে তা আর শেষ হয়না। হজরত মহম্মদের একটি কথা প্রায় ভবিষ্যৎ বাণীর মত সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। সেটি এই যে:

'আমার উম্মাহ্‌র অন্দরে যখন তরবারির প্রবেশ ঘটবে, তখন তা আর কখনোই ফিরে যাবে না।'[১]

এক্ষেত্রে মুসলমানরা একটি ব্যতিক্রমী সম্প্রদায়। বিষয়টির গভীরতর পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এর কারণ সহিংসতার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা। ধর্মীয় আইনের মাধ্যমে সহিংসতাকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে।ধর্মীয়আইন যেহেতু অপরিবর্তনীয়, সেই বৃত্তে সহিংসতাকে ন্যায্যতা প্রদান করা হয়েছে এবং তা সংশোধনের কোনো সুযোগ নেই।

এই 'ন্যায্যতা প্রাপ্ত' সহিংসতা বিষয়টি কী? সেটি ইসলামিক জিহাদের নামে সহিংসতার প্রসার ঘটানো। মুসলমান ইতিহাসে, সমস্ত যুদ্ধ জিহাদের নামে ঘটেছে। ইসলামিক জিহাদের প্রথাগত ধারণা অনুসারে দুই রকম অবস্থাতেই সাফল্য অপেক্ষমান ঃ জয় এবং পরাজয় উভয়ই সাফল্যের দ্যোতক।

যদি তারা বিজয়ী হয়, যে সমস্ত মুসলমানরা জিহাদের সঙ্গে যুক্ত, তারা জাগতিক মাত্রায় লাভবান হয়। আর যদি তারা পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তারা শহীদ হয়ে

স্বর্গলাভ করে। সঠিকভাবে বললে, ইসলামে *কিতল* অর্থে জিহাদ বা যুদ্ধ শুধু মাত্র আত্মরক্ষার্থে গ্রহণ করা যেতে পারে। আত্মরক্ষা বিষয়টি কেবলমাত্র রাষ্ট্রের বিচার্য, এটি বিরল ঘটনা। যে সমস্ত মুসলমান আন্দোলনকারীরা ইসলামের নামে যুদ্ধে রত, তাঁরা 'অ-রাষ্ট্রীয় ঘটক' (নন-স্টেট অ্যাক্টর)। কোনো প্রতিষ্ঠিত মুসলমান রাষ্ট্র এই কর্মকাণ্ডে জড়িত নয়। বর্তমান সহিংসতার এই প্রকৃতি সাধারণভাবে অনৈস্লামিক। এটি ইসলামের একটি স্বীকৃত নীতি যে

"যুদ্ধ ঘোষণা করার বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বিশেষ অধিকার।"[২]

এই নীতি অনুসারে, যে সকল *মুজাহিদিন* যুদ্ধে রত আছে, ইসলামে তাদের কাজের কোনো যৌক্তিকতা নেই। এই মানুষদের একতরফা ভাবে এবং নি:শর্তভাবে এই সমস্ত কাজ ছেড়ে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত।

বিশেষ করে বর্তমান সময়ে এইধরনের যুদ্ধের কোনো সম্ভাবনা নেই। এখন, আধুনিক সর্বজনীন স্বাভাবিকতা অনুসারে, মানুষের সামনে শান্তি ছাড়া আর কিছু নির্বাচনের পথ খোলা নেই।

পরবর্তীকালে মুসলমানদের যুদ্ধগুলি তাদের দেশের আত্মরক্ষার্থে করা হয়নি। তাদের দাবি অনুসারে, তারা পীড়নের অবসান ঘটিয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত যুদ্ধের দায়িত্ব তুলে নিয়েছে। সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে এই যুদ্ধ তাদের নিজেদের সৃষ্টি। কোরান অথবা হাদিস, কোথাও শোষণপীড়নের অবসান ঘটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করার বিষয়ে মুসলমানদের প্রতি কোনো নির্দেশ নেই।

সত্য এই যে, এই 'ন্যায্যতাপ্রাপ্ত' যুদ্ধের ধারণা, যা আসলে অন্যায় যুদ্ধ, ইসলামি ধর্মশাস্ত্র, কোরান এবং হাদিসের ভুল ব্যাখ্যার উপরে গড়ে তোলা হয়েছে।

আসলে এই ভিত্তিহীন যুদ্ধের চূড়ান্ত খারাপ রূপটা আমরা দেখি যখন প্রথমে তা অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে সংঘটিত হলেও, দ্বিতীয় পর্বে, মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পরিণতি পায়।

এর কারণ এই যে যারা যুদ্ধ করে, তারা যখন দেখতে পায় যে যুদ্ধ থেকে তারা ইতিবাচক কোনো ফলই লাভ করেনি, তারা ভাবতে শুরু করে যে নিশ্চয় তাদের বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্ত হয়েছে যার কারণে তাদের সমস্ত শ্রম বিফল হয়েছে।

তখন তারা নিজের সম্প্রদায়ের লোকেদেরও চক্রান্তকারী বলে ভাবতে শুরু করে এবং মনে করতে থাকে যে তাদের ব্যর্থতায় এই মানুষগুলিরও একটা ভূমিকা আছে।

এটা ভাবা এবং বলার পরেই তারা নিজ সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গেও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

যখন এই অবস্থা সৃষ্টি হয়, তখন 'মন্দ' তার সকল সীমা ছাড়ায় এবং মুসলমানরা মুসলমানদের মারতে শুরু করে। হজরত মহম্মদ এই মন্দটি বিশেষরূপে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ; তিনি বলেছিলেন 'উম্মাহ্'-র মধ্যে ধীরে ধীরে এই ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের উদয় হবে। একটি হাদিস অনুসারে, হজরত মহম্মদ বলেছিলেন ঃ

'আমার পরে তোমরা অবজ্ঞাকারী হওনা, যারা - একে অপরকে হত্যা করে, ।'[৩]

হজরত মহম্মদের এই ভবিষ্যদ্বাণী একবিংশ শতাব্দীতে সফল হয়েছে। আজ আমরা গোটা পৃথিবী জুড়ে দেখি মুসলমানরা মুসলমানদের মারছে। আত্মঘাতী বোমাহানায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় বোমারু এবং আক্রান্ত,উভয়েই মুসলমান।

এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বর্তমান সময়ে মুসলমানদের মধ্যে সহিংসতা চূড়ান্ত মন্দের রূপ গ্রহণ করেছে। মুসলমানদের কাছে এটি এক ধরণের সাবধানবাণী যে যদি তারা অনুশোচনা প্রকাশ করে হত্যা ও রক্তপাতের পথ পরিত্যাগ না করে, তাহলে তারা ঈশ্বরের চোখে 'কাফির' (অবিশ্বাসী) রূপে পরিগণিত হওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছে।

হজরত মহম্মদের এই সতর্কীকরণ আজকের মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত ; আন্তরিক অনুশোচনা প্রকাশ করে, এক মুহূর্ত কালক্ষেপ না করে তাদের সর্বতোভাবে সহিংসতা পরিহার করা উচিত। তাদের অস্ত্রগুলি সমুদ্রে নিক্ষেপ করে শান্তিপূর্ণ নাগরিক জীবন যাপন করা উচিত।

এই মুসলমানদের জন্য আর কোনো পথ খোলা নেই।

শান্তিসদনে ঈশ্বরের আহ্বান

নিচে উদ্ধৃত কোরানের এই আয়াতটি মুসলমানদের বর্তমান অবস্থার জন্য তাৎপর্যপূর্ণঃ

'এবং ঈশ্বর শান্তিসদনে আহ্বান করিতেছেন' (১০ঃ২৫)।

এখানে শান্তিসদন অর্থে স্বর্গ, কারণ স্বর্গই হল আদর্শ শান্তির জায়গা। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সমস্ত মানুষকে আহ্বান করে বলছেন, ‘‘যদি তোমরা অনন্ত স্বর্গে প্রবেশের বাসনা পোষণ কর, তাহলে তোমাদের শান্তির সংস্কৃতি গ্রহণ করতে হবে। শান্তিপূর্ণ ধারায় তোমাদের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলতে হবে।’’

কোরানের অন্য একটি আয়াতে, স্বর্গ প্রসঙ্গে তার পরিবেশের এইরূপ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

'সেখানে তারা কোনো রকম অর্থহীন বা পাপপূর্ণ কথা শুনতে পাবে না, কেবল স্নিগ্ধতা এবং প্রশান্তির কথা' (৫৬ঃ২৫-২৬)।

এটিই স্বর্গের সেরা বর্ণনা। এটি একটি আদর্শ জায়গা, নিখুঁত সমাজ। সেখানে কোনো উপদ্রব বা অবাঞ্ছিত কাজকর্মের অবকাশ নেই। সর্বার্থেই স্বর্গে শান্তির সংস্কৃতি বিরাজ করবে। স্বর্গের এই বর্ণনায় সকলের জন্য একটি সাবধানবাণীও আছে ; 'হে মানুষ ! যদি তোমরা স্বর্গে প্রবেশ করতে চাও, তোমরা সমস্ত রকম সহিংস কার্যকলাপ ত্যাগ কর। তোমরা শান্তির সংস্কৃতি গ্রহণ কর। স্বর্গ একটি ঘৃণামুক্ত স্থান, সেখানে ঘৃণার কোনো স্থান নেই। যারা এই পৃথিবীতে ঘৃণা নিয়ে বাস করে, তারা কখনই স্বর্গে প্রবেশাধিকার পাবে না।'

হজরত মহম্মদ সর্বার্থে একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন। একথা সত্য যে তাঁর জীবনকালে কিছু যুদ্ধ ঘটেছিল, কিন্তু এর সবগুলিই আত্মরক্ষার্থে সংঘটিত হয়েছিল। ৬২৪ খৃষ্টাব্দে বদরে এইরকম একটি যুদ্ধ ঘটেছিল। পরম্পরাসূত্রে আমরা জানতে পারি যে এই যুদ্ধটি যখন চলছিল, তখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কিছু দূরে একটি অস্থায়ী ঘাঁটিতে হজরত মহম্মদ অবস্থান করছিলেন। তাঁকে দেখা গেল বালিতে কিছু দাগ কাটতে।

লেখক মেজর আকবর খান অনুমান করেছেন যে হজরত মহম্মদের ঐ আচরণ নিশ্চয় যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি মন্তব্য করেন ঃ

ইসলামের নেতা তাঁর পরবর্তী যুদ্ধ পরিকল্পনা করছিলেন।[১]

এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক, তথ্যের ভিত্তিতে এই মন্তব্য করা হয়নি। কিন্তু আমরা যদি অন্যান্য পরম্পরাগুলির দিকে মনোযোগ দিই, তাহলে আমরা বুঝতে পারব হজরত মহম্মদ সেই সময় ভবিষ্যৎ শান্তি প্রতিষ্ঠা বিষয়ে পরিকল্পনা করেছিলেন।[২]

আমরা অন্য একটি হাদিস থেকে জানতে পারি যে, হজরত মহম্মদ একদিন তাঁর অনুচরদের সঙ্গে বসেছিলেন; এমন সময় দেবদূত জিব্রাইলের আবির্ভাব হয়। সেইসময় আকাশপথে আর একজন দেবদূত অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জিব্রাইল হজরতকে বলেন ঃ

"হে মহম্মদ! এই দেবদূত তার সৃষ্টির পর থেকে প্রথমবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে।" সেই দেবদূত হজরত মহম্মদকে বলেছিলেন ঃ "হে মহম্মদ! ঈশ্বর আমাকে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে এই প্রশ্ন করার জন্য আপনি কী হতে চান, রাজা-পয়গম্বর না বার্তাবহ-পয়গম্বর?" তখন জিব্রাইল হজরত মহম্মদকে বলেন, "আপনার ঈশ্বরের জন্য আপনি বিনয়ের পথ অবলম্বন করুন, হে মহম্মদ!" হজরত মহম্মদ উত্তর করেন, "বার্তাবহ-পয়গম্বর।"[৩]

এই পরম্পরা থেকে আমরা হজরত মহম্মদের চিন্তন সম্পর্কে একটা ধারণা পাই। তাঁর চিন্তন রাজনৈতিক ছিলনা তাতে উপদেশ ভাবের গুরুত্ব বেশি ছিল। পৃথিবীতে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য হজরত মহম্মদের ছিলনা, তিনি মানুষের কাছে একটি অরাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন।

অনুরূপভাবে, হজরত মহম্মদের একটি প্রার্থনাতে বলা হয়েছে ঃ 'হে ঈশ্বর, তুমি শান্তি।তোমার থেকেই শান্তি সৃষ্টি হয় এবং শান্তি তোমার কাছেই ফেরৎ যায়। হে ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর যেন আমরা শান্তিতে থাকতে পারি। হে ঈশ্বর, তোমার শান্তিসদনে আমাদের প্রবেশ অবাধ কর। হে ঈশ্বর, তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশক্তিমান!'[৪]

এই কথাগুলি এবং যুদ্ধের পরে যা ঘটেছিল, তা একটি সম্পূর্ণ আলাদা গল্প বলে। হজরত মহম্মদকে বাধ্য হয়ে বদরের যুদ্ধে যোগ দিতে হয়েছিল, কারণ তাঁর বিরোধীরা এই যুদ্ধ শুরু করেছিল। পরে কিন্তু তিনি সর্বদাই যুদ্ধ এড়াতে চেয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত একটি সমঝোতার সময় তিনি একতরফাভাবে বিরোধীদের সমস্ত শর্ত মেনে নেন, যাতে উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এইভাবে হুদায়বিয়ার শান্তি চুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্য এই যে, যুদ্ধ বিষয়টি ঈশ্বরের সৃষ্টি পরিকল্পনার বিরোধী।

ঈশ্বরের পদ্ধতি অনুসারে, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী সমস্ত ব্যক্তির আধ্যাত্মিক ধারায় নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের বিকাশের চেষ্টা করা উচিত। অন্তর থেকে সমস্ত নেতিবাচক উপাদান বর্জন করে, প্রত্যেক মানুষের নিজের মনকে সম্পূর্ণভাবে ইতিবাচক করে তোলা উচিত। কোরান অনুসারে, প্রত্যেক ব্যক্তির একটি মহিমান্বিত চরিত্রের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত (৬৮ঃ৪)।

সংক্ষেপে, ঈশ্বরের পরিকল্পনা এই যে চরিত্র নির্মাণের প্রক্রিয়াটি প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকবে। এই পদ্ধতিটি কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ফলপ্রসূ হতে পারে, সহিংসতা ও সংঘর্ষের পরিবেশে নয়। এইরকম একটি অবস্থায় যুদ্ধবাজরা কেবল কিছু শান্তিবাদী মানুষের পরিকল্পনা বিরোধী কাজ করে এমন নয়; তারা দৈব পরিকল্পনারও পরিপন্থী। ঈশ্বরের কর্মপরিকল্পনা ও কর্মবিন্যাসকে বিপন্ন করে তোলার চেষ্টা।

যুদ্ধের বিষয়টি নির্বাচন করা এমন এক অপরাধ, যা ঈশ্বর কখনই ক্ষমা করবেন না। এর স্পষ্ট প্রমাণ এই যে যারা যুদ্ধের পথ নির্বাচন করেছে, বহু দশক ধরে বহু বলিদানের পরেও তারা কখনই তাদের কাঙ্ক্ষিত ফললাভ করে নি। একথা অনস্বীকার্য যে এই সমস্ত কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তারা মুসলমানদের জীবনে এবং অন্যদের জীবনে কেবল ধ্বংসই সূচিত করেছে।

মানব ইতিহাসের ব্যবস্থাপনা

আমরা কোরান থেকে জানতে পারি যে ইতিহাসের একটি সূত্র হচ্ছে :

'ঈশ্বর যদি কিছু মানুষকে অন্যদের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে পৃথিবী ভ্রষ্টাচারে পূর্ণ হয়ে যেত' (২:২৫১)।

এখানে অর্থ এই যে ঈশ্বর মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি মানবজগতের উপর কড়া নজরদারি জারি রেখেছেন। মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিরন্তর ইতিহাসের ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত। ইতিহাসের এই ব্যবস্থাপনার কারণেই, মানুষ তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করা সত্ত্বেও কোনো বড় বিপর্যয় ঘটে না।

সত্য এই যে ঈশ্বর মানুষকে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। অর্থাৎ এটি মানুষকে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানোর জন্য দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতা ব্যতীত এই উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না। কিন্তু স্বাধীনতা থেকেই প্রায়শ স্বাধীনতার অপব্যবহার ঘটে। সেই কারণে স্রষ্টা সর্বক্ষণ মানবসভ্যতার বিবর্তনের উপর নজর রেখে চলেছেন, যাতে স্বাধীনতার অপব্যবহার এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছয় যে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি পরিকল্পনা বিঘ্নিত হয়। সেই কারণেই ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা রাজতন্ত্রের যুগের অবসান ঘটিয়েছিলেন, কারণ রাজতন্ত্র মানুষের স্বাধীনতা সমর্থন করত না।

১৯২২ সালে কমিউনিস্ট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ব্যক্তি স্বাধীনতায় কঠোর সীমাবদ্ধতা জারি করা হল। এটি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের সৃষ্টি পরিকল্পনার বিরোধী ছিল। সেই কারণেই ১৯৯১ সালে ৬৯ বছর বয়সী কমিউনিস্ট সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল। এটি দুর্ঘটনা রূপে ঘটে নি, এটি নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বরের ইতিহাস-ব্যবস্থাপনার কারণে ঘটেছিল।

এখন এই একই পদ্ধতি তাদের জন্যও ক্রিয়াশীল, যারা আত্মনির্মিত যৌক্তিকতার দ্বারা সহিংস আন্দোলন শুরু করেছেন। এই ধরনের কার্যকলাপই সন্ত্রাসবাদের বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত। এই ধরনের সন্ত্রাসবাদ সাধারণত অ-রাষ্ট্রীয় কার্যকর্তাদের মাধ্যমে

ঘটে থাকে এবং এটি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের সৃষ্টি পরিকল্পনার বিরোধী। একথা নিশ্চিত যে এর আয়ুকাল খুবই সীমিত হবে।

আমার মতে, এই সন্ত্রাসবাদ, তা জিহাদের নামে বা অন্য যে কোনো নামেই সংঘটিত হক না কেন, নিঃসন্দেহে একদিন ঈশ্বর কর্তৃক নির্মূল হবে। আমরা নিরাপদে বলতে পারি যে উন্মূলনের এই পদ্ধতি ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে।

বহু বড় বড় আত্মত্যাগ সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি তাদের লক্ষ্যপূরণে অসফল হয়েছে। এই জঙ্গী গোষ্ঠীগুলি পৃথিবীতে কেবল ধ্বংস ও মৃত্যু নিয়ে এসেছে। এর ফলে, বিশ্ব মতামত তাদের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে। ইতিহাসে ইতিবাচক মাত্রায় নথিবদ্ধ হবে এমন কোনো অবদানের দৃষ্টান্ত রাখতে সন্ত্রাসবাদীরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এই নেতিবাচক ফলই পরিষ্কার চিহ্ন যে ঈশ্বর তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং, কোরানের মাত্রায় বললে, প্রতিহত করার এই নিয়ম তাদের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল। একথা প্রায় নিশ্চিত যে অতি সত্বর সন্ত্রাসবাদ নির্মূল হবে বা উল্লেখযোগ্য ভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে।

সন্ত্রাসবাদের এই প্রত্যাশিত ফল আমাদের বলে যে সম্ভবত খুব সম্প্রতি সন্ত্রাসবাদ- উত্তর যুগের উদয় হবে এবং সেটি হবে শান্তির যুগ। তখন স্রষ্টার ইচ্ছানুসারে গঠনমূলক কাজকর্মগুলি শুরু হবে, যেগুলি সন্ত্রাসবাদের কারণে আজ পর্যন্ত শুরু করা যায় নি।

সেই শান্তির যুগের সমস্ত কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হবে এই যে ধর্ম ও সহিংসতা বাস্তবে একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হবে। এই বিচ্ছিন্নতার ফলে মানবসভ্যতার জন্য নিঃসন্দেহে এক নতুন শান্তির যুগের সূচনা হবে।

গণমাধ্যমে বর্তমান পৃথিবীর যে চিত্র তা সহিংসতায় পূর্ণ। কিন্তু এই দৃশ্যগুলির পিছনে অবস্থা যথেষ্ট আলাদা - এই আপাত সহিংস কার্যকলাপের মধ্যে একটি নিঃশব্দ পদ্ধতি কাজ করে চলেছে। এই পদ্ধতি ইতিহাসকে সহিংসতা থেকে শান্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। স্টকহোম আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা কেন্দ্র (স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পীস রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট-সিপ্রি)-র একটি প্রতিবেদন অনুসারে, বর্তমানে নটি দেশের কাছে পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র আছে। এই সবকটি দেশই কোনো না কোনো সমস্যার সম্মুখীন, কিন্তু ১৯৪৫ সালে হিরোশিমা আর নাগাসাকির উপর আণবিক বোমা নিক্ষেপের পর ইতিহাসে আর কখনও এই ধরনের যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের উদাহরণ দেখা যায় নি।

আণবিক বোমাগুলির ব্যবহারের ভয়ংকর ফলাফল সহিংসতার চূড়ান্ত পর্যায়কে চিহ্নিত করেছিল। সহিংসতার সেই চূড়ান্ত রূপ যখন ব্যবহার করা হয়েই গিয়েছে,

তখন সহিংসতায় অন্য আর কোনো যতিচিহ্ন ব্যবহারের অবকাশ নেই; আমরা বলতে পারি সহিংসতায় পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গিয়েছে। অতএব একথা নিশ্চিত যে এই বোমাগুলি ভবিষ্যতে আর কখনও ব্যবহৃত হবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে আণবিক বোমার ব্যবহার যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি করেছিল, তার থেকে একটি বার্তা পাওয়া গিয়েছিল যে সহিংসতার কৌশল পৃথিবীতে আর কাজ করবে না।

সমস্ত সংকেত থেকে বোঝা যায় যে মানব ইতিহাস সহিংসতা থেকে শান্তির অভিমুখে যাত্রা করেছে।

বিশ্ব শান্তি কেন্দ্র

অ্যালফ্রেড নোবেল (১৮৩৩-১৮৯৬)-এর জন্ম হয়েছিল সুইডেনের স্টকহোম শহরে। তরুণ বয়সে তিনি তাঁর বাবার অস্ত্র কারখানায় কাজ করতেন। মেধাগতভাবে অনুসন্ধিৎসু নোবেল, রসায়ন ও বিস্ফোরক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকেন এবং এক সময়ে ডিনামাইট আবিষ্কার করেন। একজন শিল্পোদ্যোগী হিসেবে তাঁর ক্ষমতাকে ধন্যবাদ এবং বিস্ফোরকগুলির উপর নেওয়া পেটেন্টের ফলে নোবেল অচিরেই অতুল বৈভবশালী হয়ে ওঠেন।

১৮৬৪ সালে তাঁর নাইট্রোগ্লিসারিন কারখানায় একটি মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটে, যার ফলে তাঁর ছোট ভাই এবং আরো অনেক মানুষ মারা যায়। একটি ফরাসী দৈনিক সংবাদপত্র ভুলক্রমে ভেবেছিল স্বয়ং অ্যালফ্রেড নোবেলই মারা গিয়েছেন। সংবাদপত্রটি *দ্য মার্চেন্ট অব ডেথ ইজ ডেড* (মৃত্যু ব্যবসায়ী মৃত) এই শিরোনামে একটি শোকসংবাদ প্রকাশ করে। তাতে বলা হয় :

‘ডঃ অ্যালফ্রেড নোবেল, যিনি পূর্বের তুলনায় দ্রুততর পদ্ধতিতে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ মারার কৌশল আবিষ্কার করে ধনী হয়েছিলেন, গতকাল মারা গিয়েছেন।[১]

এটা পড়ে নোবেল খুবই আঘাত পান। তিনি ভাবতে শুরু করলেন কি উপায়ে তাঁর নষ্ট হয়ে যাওয়া ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর সেই অতুল বিত্ত তাঁর নামে একগুচ্ছ পুরস্কারের জন্য চিহ্নিত করে রেখে যান। তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্রে, নোবেল তাঁর সমগ্র সম্পদের ৯৪ শতাংশ, অর্থাৎ ৩১ মিলিয়ন সুইডিশ ক্রোনর (প্রায় ১৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) পাঁচটি নোবেল পুরস্কারের প্রতিষ্ঠা ও মূল্যনির্ধারণের জন্য রেখে যান। নোবেল পুরস্কার সংগঠনটি শান্তি ও অন্যান্য বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের পুরস্কার প্রদানের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত হয়েছে। ভাবমূর্তি নির্মাণে অ্যালফ্রেড নোবেলের পরিকল্পনা খুবই সফল হয়েছিল। আজ পৃথিবী তাঁকে শান্তির একজন মহান পৃষ্ঠপোষক রূপে চেনে।

অ্যালফ্রেড নোবেলের এই কাহিনি, অর্থাৎ তিনি কিভাবে যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কার করতেন ও সেগুলি বিক্রি করে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করতেন, যে সমস্ত কাজ তাঁর ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করেছিল, বর্তমান দিনে মুসলমানদের জন্য প্রাসঙ্গিক।

আজকের মুসলমানরা, কোনো রাজনৈতিক কারণবশত সেই একই কাজ করে চলেছেন, শুধু একটি পার্থক্য আছে: অ্যালফ্রেড নোবেল যুদ্ধাস্ত্রের বাণিজ্য সংগঠিত করেছিলেন আর মুসলমানরা আধুনিক অস্ত্রের ভিত্তিতে সহিংসতার সংস্কৃতি সংগঠিত করে থাকেন। যদি অ্যালফ্রেড নোবেল মানবনিধনে অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িতে থেকে থাকেন, মুসলমানরা তাতে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছেন।

অ্যালফ্রেড নোবেলের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি ধাক্কা খেয়েছিল। মুসলমানদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো গুরুতর। মুসলমানরা ইসলামের নামে সহিংসতার সংস্কৃতি প্রচার করেছে, এবং সেই সহিংসতা কার্যকর করে তুলেছে; ফলত, ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই যুগ গণমাধ্যমের যুগ, ফলে মুসলমানদের ঘটানো প্রতিটি সহিংসতার দৃষ্টান্ত মুহূর্তের মধ্যে নেতিবাচক খবর হয়ে বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। সমগ্র বিশ্বজুড়ে সহিংসতার ধর্মরূপে ইসলামের ভাবমূর্তি নির্মাণ হয়।

অ্যালফ্রেড নোবেল তাঁর নিজের অখ্যাতির দায় অন্য কারো ঘাড়ে চাপিয়ে সময় নষ্ট করেন নি; তিনি নিজের সমস্ত দায় স্বীকার করে শান্তির জন্য একটি অনন্য পরিকল্পনা করে নিজের ভাবমূর্তি পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন।

এখন মুসলমানদের জন্যও অবিলম্বে একটি ইউ-টার্ন অর্থাৎ তারা যে পথে অগ্রসর হচ্ছে, তার সম্পূর্ণ বিপরীত পথ গ্রহণ করার সময় উপস্থিত হয়েছে। মুসলমানদের উচিত ঈশ্বরের নির্দেশ মান্য করে চলা:

“বিশ্বাসীগণ! ঈশ্বরের দিকে ফেরো; তোমরা প্রত্যেকে, যাতে তোমাদের সমৃদ্ধি ঘটতে পারে।”(২৪:৩১)

এই ভাবমূর্তি নির্মাণ পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ উপায় হল সারা বিশ্বের মুসলমানদের সম্মিলিত উদ্যোগে *বিশ্ব শান্তি কেন্দ্র* নামক একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। সমস্ত মুসলমান দেশগুলির, সংগঠনগুলির এবং বিত্তবান মুসলমানদের এই কেন্দ্রের সদস্য হওয়া উচিত। **সমস্ত মুসলমানের সাধারণ সমর্থনে বিশ্ব শান্তি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আন্তর্জাতিক মানের ভিত্তিতে এই কেন্দ্রের পরিকল্পনা করা উচিত এবং এটি সম্পূর্ণভাবে অরাজনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক ও অবাণিজ্যিক চরিত্রের হওয়া কাম্য।** এই কেন্দ্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শান্তি প্রচার এবং সহিংসতার সংস্কৃতিকে সরিয়ে শান্তির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠাই এই কেন্দ্রের লক্ষ্য হবে।

ঈশ্বরের কাছে মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি ঋণ আছে - সেটি এই যে প্রতিটি মুসলমানকে এই পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর কাছে ঈশ্বরের বাণী ছড়িয়ে দিতে হবে।

শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে এই কাজটি চূড়ান্ত মাত্রায় করতে হবে। মুসলমানদের এই বিশ্বব্যাপী দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে বিশ্ব শান্তি কেন্দ্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। যদি মুসলমানরা ইসলামের ভাবমূর্তির পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট হয়, অর্থাৎ বর্তমান ধারণানুসারে ইসলাম 'সহিংসতার ধর্ম' থেকে 'শান্তির ধর্ম', এই ভাবমূর্তি গড়ে তোলার বিষয়ে মুসলমানরা সচেষ্ট হয়, ঈশ্বর নিশ্চয় তাদের সহায় হবেন।

বর্তমানে মুসলমানরা সংখ্যায় লক্ষ কোটিরও বেশি এবং তারা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। সমস্ত রকমের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ মুসলমান দেশগুলিতে পাওয়া যায়। এই সম্পদগুলির শ্রেষ্ঠ ব্যবহার হবে যদি তা ইসলামের ভাবমূর্তি নির্মাণে ব্যয় হয় এবং এই উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে *বিশ্ব শান্তি কেন্দ্র* গড়ে তোলা উচিত।

তথ্যসূত্র

প্রাককথন

১. সহিহ্, আল-বুখারি, হাদিস সংখ্যা ৩০৬২।

প্রথম অধ্যায় ঃ শান্তির জন্য শান্তি

শান্তিবাদের উপর

১. (আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm>) (১৯শে জুলাই, ২০১৫ তারিখে প্রাপ্ত)

শান্তি এবং ন্যায়

১. (আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm>) (১৯শে জুলাই, ২০১৫ তারিখে প্রাপ্ত)

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ শান্তির যুগের আবির্ভাব

একচেটিয়া অধিকার মোচনের যুগ

১. জন ফ্রেডরিক ওয়েস্ট, *দ্য গ্রেট ইন্টেলেকচুয়াল রেভোলিউশন,* নিউ ইয়র্ক, দ্য সিটাডেল প্রেস, ১৯৬৬।

পশ্চিমী সভ্যতা

১. সহিহ্, আল-বুখারি, হাদিস সংখ্যা ৩০৬২।

শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা সাধন

১. দ্য বাইবেল, ম্যাথিউস ৫:৪৪।

২. “দ্য সার্চ ফর অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ” নিউজউইক, জানুয়ারী ১১, ১৯৮৮

তৃতীয় অধ্যায় ঃ শান্তির জন্য বিরোধহীন উপায়সমূহ

স্রষ্টার সৃষ্টিবিধান

১. সহিহ্, আল-মুসলিম, হাদিস সংখ্যা ২৫৯৩।

পারস্পরিক হস্তক্ষেপহীনতার নীতি

১. ইবন হিশাম, সিরাত ইবন হিশাম, ইজিপ্ট, মুস্তাফা আল-বাবি আল-হালাবি অ্যান্ড সন্স, ১৯৫৫, প্রথম খন্ড, পৃ.৫০৩

'নিজেকে বাঁচাও' ফর্মুলা

১. দ্য বাইবেল, লিউক ৬:২৯

২. সহিহ্, আল বুখারি, হাদিস সংখ্যা ১৮৭১

বিচ্ছিন্ন করার নীতি

১. ই ই কেলেট, *আ শর্ট হিস্ট্রি অব রিলিজিয়ন্‌স্*, লন্ডন, ভিক্টর গোলান্স্‌জ্ লিমিটেড, ১৯৯৩, পৃ.৩৩৪।

হিংসার ক্ষমতা অপেক্ষা শান্তির ক্ষমতা বেশি

১. মাইকেল এইচ হার্ট, *দ্য১০০ : আ র‍্যাংকিং অব দ্য মোস্ট ইনফ্লুয়েনশিয়াল পার্সন্‌স্ ইন হিস্ট্রি,* নিউ ইয়র্ক, সিটাডেল প্রেস, ১৯৭৮, পৃ.৩

২. সহিহ্, আল-বুখারি, হাদিস সংখ্যা ৩৫৬০

দুজন পয়গম্বরের প্রতিষ্ঠা করা উদাহরণ

১. দ্য বাইবেল, জেনেসিস ৪১:৪০।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ইতিহাসের অভিজ্ঞতা

আদর্শবাদ ও বাস্তবধর্মিতার মধ্যে বাঁচা

১. জেমস জিন্স্, *দ্য মিস্টিরিয়াস ইউনিভার্স*, কেম্ব্রিজ, কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৩০, পৃ.৩

বাস্তবতার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ পরিকল্পনা

১. রাজমোহন গান্ধী, এইট লাইভস্ : আ স্টাডি অব দ্য হিন্দু-মুসলিম এনকাউন্টার, নিউ ইয়র্ক, সানি প্রেস, ১৯৮৬, পৃ.১৭৪

২. "মুশাররফ স্পীচ হাইলাইটস, বিবিসি, জানুয়ারী ১২, ২০০২", <http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia 1757251.stm>.

(১৯শে জুলাই, ২০১৫ তারিখে প্রাপ্ত)

সহিংস কর্মকান্ড, শান্তিপূর্ণ কর্মকান্ড

১. এডওয়ার্ড গিবন, *দ্য হিস্ট্রি অব দ্য ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অব দ্য রোমান এম্পায়ার*, নরওয়াক, দি ইস্টন প্রেস, ১৯৭৪, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ.৬৯।

যে ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল

১. সাকিনা ইউসুফ খান, "ইউ এস অ্যাগ্রেশন উড বি কাউন্টার-প্রডাক্টিভ", দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, নতুন দিল্লি, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ <http://timesofindia.indiatimes.com/india/ইউ এস - অ্যগ্রেশন - উড - বি - কাউন্টার - প্রডাক্টিভ/আর্টিকল শো / ৪৭১৯২৯৪৫৫. সি এম এস>(২০শে জুলাই, ২০১৫ তারিখে প্রাপ্ত)

২. "দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার", ক্যালিডনিয়ান মার্কারি (১৫৬১৯), ১৫ই অক্টোবর, ১৮২১, পৃ.৪

ঐতিহাসিক স্থিতাবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখো

১. সহিহ্ আল-বুখারি, হাদিস সংখ্যা ১২৬।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা

১. জন টোলান্ড, *দ্য রাইজিং সান ঃ দ্য ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অব দ্য জাপানিজ এম্পায়ার*, ১৯৩৬-১৯৪৫, নিউ ইয়র্ক, র‍্যান্ডম হাউস, ১৯৭০, পৃ.৮১৭।

২. ইজ্জুদ্দিন ইবন আল-আথির, আল-কামিল ফি আল - তারিখ, বেইরুট, দর সাদির, ১৯৮২, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ.৩৮৪।

৩. টমাস ওয়াকার আর্নল্ড, *দ্য প্রীচিং অব ইসলাম*, লন্ডন, কন্স্টেবল অ্যান্ড কোং লিমিটেড, ১৯১৩। অধ্যায় ঃ দ্য স্প্রেড অব ইসলাম অ্যামং দ্য মোঙ্গলস অ্যান্ড দ্য টার্টার্স্, পৃ. ১৬৮-১৯২।

৪. ফিলিপ কে হিট্টি, *হিস্ট্রি অব দি অ্যারাব্স*, লন্ডন, পলগ্রেভ ম্যাকমিলান, ২০০২, পৃ.৪৮৮।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ একটি প্রতি - আদর্শের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান যুগে মুসলমানদের প্রসঙ্গ

১. দ্য বাইবেল, ইসাইয়া ৪৩:১২।

একটি সাহিত্য বোমা প্রয়োজন

১. ইউজিন লায়ন্স, *মিলোভান ডিলাস অ্যান্ড দ্য বুক দ্যাট ইজ শেকিং দ্য কমিউনিস্ট ওয়ার্ল্ড*, রিডার্স ডাইজেস্ট, অক্টোবর ১৯৫৭।

২. "ব্যাটলিং ইসলামিক স্টেট", *দ্য হিন্দু*, ১২ই জুন, ২০১৫, পৃ.১০

৩. টিম রস, "ডেভিড ক্যামেরন টেল্‌স্ টিনেজ জিহাদিস্টস দে আর *ক্যানন ফডার*," দ্য টেলিগ্রাফ, ১৯শে জুলাই, ২০১৫ <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11748953/David-Cameron-tells-teenage-jhadists-they-are-cannon-fodder.html>(২১শে জুলাই, ২০১৫ তারিখে প্রাপ্ত)

৪. ইউনেস্কো (UNESCO), <http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/history/constitution>(১৯শে জুলাই, ২০১৫ তারিখে প্রাপ্ত)

নির্বাচিত তথ্যের কুফল

১. সায়োভান ফেন্টন, "চার্চ অব ইংল্যান্ড 'ওয়ান জেনারেশন অ্যাওয়ে ফ্রম এক্সটিংশন' আফটার ড্রামাটিক লস অব ফলোয়ার্স", দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ১লা জুন, ২০১৫, <http://www.independent.co.uk/news/uk / church-of-england-one-generation-away-from-extinction-after-dramatic-loss-of-followers-10288179, html>(১৯শে জুলাই, ২০১৫ তারিখে প্রাপ্ত)

২. "ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স ফেসেস বয়কট ফর 'ইসলামোফোবিয়া অ্যাট ৩০,০০০ ফিট", দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লি, ৩১শে মে, ২০১৫, পৃ.২২।

আত্মঘাতী বোমাহানা

১. সহিহ্, আল-বুখারি, হাদিস সংখ্যা ৩০৬২।

২. খলিল জিব্রান, দ্য প্রফেট, নিউ ইয়র্ক, নফ ডাবলডে পাবলিশিং গ্রুপ, ১৯২৩, দ্বাদশ অধ্যায়।

৩. সহিহ্, আল-বুখারি, হাদিস সংখ্যা ১৩১২।

দৃষ্টিকোণের উপরেই সমস্ত নির্ভর করে

১. লেসলি ভার্নিক, *লর্ড, আই জাস্ট ওয়ান্ট টু বি হ্যাপি*, ইউজিন, হার্ভেস্ট হাউস পাবলিশার্স, ২০০৯, পৃ.২০৪।

তরুণরা কেন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীতে যোগ দিচ্ছে?

১. মুসনাদ আহমদ, হাদিস সংখ্যা ২৩৮১৪।

২. ভার্জিনিয়া পেজ ফর্টনা, 'ডু টেররিস্টস উইন? রেবেলস' ইউজ অব টেররিজম অ্যান্ড সিভিল ওয়ার আউটকামস," ইন্টার ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, ভলিউম ৬৯, ইস্যু ০৩, সামার ২০১৫, পৃ. ৫১৯-৫৫৬

৩. ফিলিপ কে হিট্টি, *দি অ্যারাবস : আ শর্ট হিস্ট্রি*, ওয়াশিংটন ডিসি, রেগনেরি পাবলিশিং, ১৯৯৬, পৃ.৫৭।

৪. আর্থার কীথ, *আ নিউ থিয়োরি অব এভোলিউশন*, লন্ডন, ওয়াটস অ্যান্ড কোং, ১৯৪৮, পৃ.৩০৩।

ষষ্ঠ অধ্যায় : মুসলিম বিশ্বে শান্তি

অসমাপ্ত কর্মসূচী

১. মতীন হায়দার, "পাকিস্তান অ্যান্ড কাশ্মীর আর ইনসেপারেব্ল্: জেনারেল রাহীল শরিফ", ডন, ৩রা জুন, ২০১৫ <www.dawn.com/news/1185928> (১৯শে জুলাই ২০১৫ তারিখে প্রাপ্ত)

শান্তির পথ

১. দ্য লাইভস অব দ্য টু রিভাইভার্স - হাসান আল-বান্না অ্যান্ড সৈয়দ কুতুব, <http://archive.org/details/TheLivesOfTheTwoRevivers_HasanAlBannaSyedQutb> পৃঃ ২৪ (১৯শে জুলাই, ২০১৫ তারিখে প্রাপ্ত)

২. ভালি নাসর, *দ্য ভ্যানগার্ড অব দি ইসলামিক রেভোলিউশন ঃ দ্য জামাত-ই ইসলামি অব পাকিস্তান*, ওকল্যান্ড, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৯৪, পৃ.১৫৩।

নীতিরূপে ভ্যাটিকান

১. ক্রিস সিলিজ্জা, “টু প্যারাগ্রাফস দ্যাট সাম আপ দি ওবামা প্রেসিডেন্সি”, দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট, ১৯শে জুন, ২০১৫, <http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2015/06/19/two-paragraphs-that-sum-up-the-frustations-of-the-obama-presidency/>(১৯শে জুলাই, ২০১৫ তারিখে প্রাপ্ত)

আত্ম সপক্ষীয় কর্মকান্ড, আত্মবিরোধী কর্মকান্ড

১. দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লি, ২৯শে মে, ২০১৫, পৃ.২০

সন্ত্রাসের সংস্কৃতি

১. “কালাশনিকভ ‘ফিয়ার্ড হি ওয়াজ টু ব্লেম’ ফর একে-৪৭ রাইফেল ডেথ্স্”, বিবিসি নিউজ, জানুয়ারী ১৩, ২০১৪, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25709371> (১৯শে জুলাই ২০১৫ তারিখে প্রাপ্ত)

২. সোলদাদ ও’ব্রায়েন, “স্নাইপার সেইজ হি ফিল্স্ শেম, গিল্ট ফর মার্ডার্স্”, সি এন এন, অক্টোবর ১২, ২০০৭, <http://edition.cnn.com/2007/US/10/09/soledad.DCsniper/index.html?iref=mpstoryview>(১৯শে জুলাই, ২০১৫ তারিখে প্রাপ্ত)

একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

১. ম্যাথিউ রোজেনবার্গ, “ইন ওসামা বিন লাদেন লাইব্রেরি: ইলিউমিন্যাটি অ্যান্ড বব উডওয়ার্ড,” দ্য নিউ ইয়র্ক টাইম্স্, ২০ শে মে, ২০১৫, <http://www.nytimes.com/2015/05/21/world/asia/bin-laden-bookshelf-list-released-by-us-intelligence-agency.html?_r=0>, [১৯ শে জুলাই, ২০১৫ তারিখে প্রাপ্ত]

সপ্তম অধ্যায় ঃ ইসলাম ও শান্তি

শান্তির ধর্ম ইসলাম

১. সুয়াব আল-ইমান, আল-বায়হাকি, ৬০০৬।

২. আল-মিনহাজ সার্‌হ্‌ সহিহ্‌ মুসলিম, বেইরুট, দর ইহ্‌য়া আল-তুরথ আল-আরাবি, ১৯৭২, দ্বাদশ খন্ড, পৃ. ২২৯

ইতিহাসের চূড়ান্ত মন্দ :

১. আল-ত্রিমিধি, হাদিস সংখ্যা ২২০২।

২. সহিহ্‌, আল-বুখারি, *বুক অব দ্য হোলি ওয়্যার*, হাদিস সংখ্যা ২৯৫৭।

৩. সহিহ্‌, আল-বুখারি, হাদিস সংখ্যা ১২১।

শান্তিসদনে ঈশ্বরের আহ্বান

১. ওয়াহিদউদ্দিন খান, *দ্য প্রফেট অব পীস*, নতুন দিল্লি, পেঙ্গুইন বুক্‌স্‌, ২০০৯, পৃ.২৮।

২. ইসমাইল ইবন কাথির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ্‌, বেইরুট, দর ইহ্‌য়া আল-তুরথ আল-আরাবি, ১৯৮৮, তৃতীয় খন্ড, পৃ.৩২৭।

৩. মুসনাদ আহমদ, হাদিস সংখ্যা ৭১৬০।

৪. ইসমাইল ইব্‌ন কাথির (লেখক), *ট্রেভর লে গাসিক* [অনুবাদক, *দ্য লাইফ অব দ্য প্রফেট মুহাম্মদ* (সিরাত ইবন কাথির)], বার্কশায়ার, গার্নেট পাবলিশিং লিমিটেড, ১৯৯৮, ২য় খন্ড, পৃ.২৬৭।

বিশ্ব শান্তি কেন্দ্র

১. ফ্রেডেরিক গোল্ডেন, "দ্য ওয়ার্স্ট অ্যান্ড দ্য ব্রাইটেস্ট", টাইম, অক্টোবর ১৬, ২০০০।

যারা সর্বদা হিংসার মাত্রায় চিন্তা করে তাদের মনের পূনর্বিন্যাসের চেষ্টা এই বইয়ের উদ্দেশ্য। সহিংস পদ্ধতির দ্বারা যা অর্জন করা যায়না, শান্তিপূর্ণ উপায়ে তা সফলভাবে অর্জন করা সম্ভব, তাদের মধ্যে এই উপলব্ধি ঘটানোই এই বইটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

"শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি বিনয় গড়ে তোলে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি সহিংস পদ্ধতি গ্রহণ করে সে দ্রুত উদ্ধত হয়ে ওঠে।"

"একজন মানুষকে হত্যা করা আর একটি প্রাণীকে হত্যা করা এক কথা নয়। মানবতার একজন সদস্যকে হত্যা করা নিজেকে হত্যা করার সামিল।"

"সহিংসতায় লিপ্ত হওয়ার জন্য কোনো বিচক্ষনতার প্রয়োজন হয় না। যে কোন মূর্খ তা করতে পারে। কিন্তু শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও শান্তিরক্ষার জন্য একটি উচ্চস্তরের বুদ্ধিমত্তা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়।"

"প্রত্যেক মানুষের কিছু অনন্য গুণ আছে, এটি স্রষ্টার সৃষ্টি পরিকল্পনার বিরুদ্ধ, যে কোন ব্যক্তি কেবল যুদ্ধ করে নিজের মৃত্যুর কারণ হবে।"

"শান্তি হল সেই 'সামাজিক ক্ষেত্র' যা আবাদ করে আমরা সামাজিক ন্যায়ের ফসল পেতে পারি। ঠিক যেমন জমি থেকে সরাসরি খাদ্য পাওয়া সম্ভব নয়, তেমনই শান্তি থেকে সরাসরি সামাজিক ন্যায় পাওয়া সম্ভব নয়।"

"ইসলামি শিক্ষানুসারে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আত্মঘাতী বোমা হানায় যে মুসলমানরা মারা যায়, তাদের মৃত্যু বিধিসঙ্গত নয়। তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য কোন স্বর্গ অপেক্ষা করে নেই।"

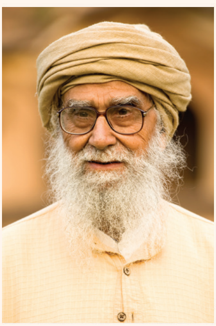

মাওলানা ওয়াহিদউদ্দিন খান শান্তিও অধ্যাত্মিকতা কেন্দ্র (সেন্টার ফর পীস অ্যাণ্ড স্পিরিচুয়ালিটি)-র প্রতিষ্ঠাতা। শান্তির পূর্ণ আদর্শের আকর রূপে ইসলামকে বিশ্বের সামনে উপস্থাপিত করা এই সংগঠনরে উদ্দেশ্য। মাওলানা ওয়াহিসউদ্দিন খান দ্য প্রফেট অব পীস, কুরানিক উইজডম, ইসলাম অ্যাণ্ড ওয়ার্ল্ড পীস এবং ইসলাম বিষয়ক আরো অনেক জনপ্রিয় গ্রন্থের রচয়িতা। বিশ্ব শান্তিতে তাঁর অবদানের জন্য তিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

Goodword Books
CPS International

ISBN 978-93-51791-61-4

PDF